হয়েছে ঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের একজন হাওয়ারী অর্থাৎ খাঁটি সহচর থাকে, আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়র— (কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আ) যখন মানুষের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা লক্ষ্য করলেন, তখন সাহায্যকারীদের খোঁজ নিলেন এবং مَنْ أَنْصَارِيْ বললেন। এর আগে তিনি একা একাই নবুয়তের দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি সূচনা থেকেই কোন সাহায্যকারী দল গঠন করার চিন্তা করেন নি। প্রয়োজন দেখা দিতেই দল গঠিত হয়ে যায়। বস্তুত জগতের সব কাজই এমনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতা চায়।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝ إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى
إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ
ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

(৫৪) এবং কাফিররা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহ্ ও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী। (৫৫) আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেবো—কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুত তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (অর্থাৎ যারা তাঁর নবুয়ত অস্বীকার করেছিল, তাঁকে হত্যা ও নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে) গোপন কৌশল অবলম্বন করলো (সেমতে ষড়যন্ত্র ও কৌশলে তাঁকে গ্রেফতার করে শূলীতে চড়াতে উদ্যত হলো) এবং আল্লাহ্ তা'আলাও (তাঁকে নিরাপদ রাখার জন্য) গোপন কৌশল অবলম্বন করলেন। (তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলো না। কারণ, আল্লাহ্ বিরোধীদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তিকে হযরত ঈসা [আ]-র আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দিলেন এবং ঈসা [আ]-কে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। এতে তিনি বিপদমুক্ত হয়ে যান এবং রূপান্তরিত ইহুদীকে শূলে চড়ানো হয়। ইহুদীরা আজ

পর্যন্ত এ গোপন কৌশলের কথা জানতেই পারেনি, প্রতিরোধের সামর্থ্য হওয়া তো দূরের কথা)। আল্লাহ্ তা'আলা শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। (কারণ অন্যদের কৌশল দুর্বল ও মন্দ এবং অস্থানেও প্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র কৌশল মজবুত, উত্তম ও হেকমত অনুযায়ী হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ কৌশল তখন অবলম্বন করলেন,) যখন তিনি (গ্রেফতারের সময় ঈসা [আ]-কে কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখে) বললেন ঃ হে ঈসা (চিন্তা করো না), নিশ্চয় আমি তোমাকে (প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায়) মৃত্যুদান করব (সুতরাং স্বাভাবিক মৃত্যুই যখন তোমার বিধিলিপি, তখন নিশ্চিতই শত্রুর হাতে শূলে নিহত হওয়া থেকে তুমি নিরাপদ থাকবে। আপাতত) আমি তোমাকে (ঊর্ধ্বলোকের দিকে) উঠিয়ে নেব, তোমাকে অবিশ্বাসীদের অপবাদ থেকে পবিত্র করব এবং যারা তোমার অনুসরণ করবে, তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের ওপরে জয়ী রাখব। (যদিও বর্তমানে অবিশ্বাসীরাই প্রবল ও শক্তিশালী।) অতঃপর (যখন কিয়ামত আসবে, তখন (দুনিয়া ও বরযখ থেকে) আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। আমি (তখন) তোমাদের (সবার) মধ্যে (কার্যত) ঐ সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেব, যাতে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করতে (তন্মধ্যে ঈসার ব্যাপারটিও অন্যতম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন ফিরকার লোকেরা আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন শব্দ ও অর্থে বিকৃতি সাধন করে হযরত ঈসা (আ)-র হায়াত এবং আখেরী যমানায় তাঁর পুনরাগমন সম্পর্কিত মুসলমানদের সর্ববাদীসম্মত আকীদা ভুল প্রমাণে সচেষ্ট রয়েছে। এ কারণে আয়াতের শব্দাবলীর পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ—আরবী ভাষায় 'মকর' শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশল। উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে 'মকর' ভাল এবং মন্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে তা মন্দও হতে পারে। এ কারণেই ولا يحيق المكر السيئ আয়াতে مكر শব্দের সাথে سيئ (মন্দ) যোগ করা হয়েছে। উর্দু ভাষার বাচনভঙ্গিতে 'মকর' শব্দটি শুধু ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ নিয়ে আরবী বাচনভঙ্গিতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আরবী অর্থের দিক দিয়েই এখানে আল্লাহ্কে 'শ্রেষ্ঠতম কৌশলী' خير الماكرين বলা হয়েছে।. উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-র বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। তারা অনবরত বাদশাহ্র কাছে বলতে থাকে যে, লোকটি আল্লাহ্দ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে বাদশাহ্ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশলও স্বীয় পথে অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে।—(তফসীরে-উসমানী)

مُتَوَفِّيْكَ — اِنِّىْ مُتَوَفِّى শব্দের ধাতু تَوَفِّى এবং মূল ধাতু وَفِى অভিধানে এর আসল অর্থ পুরাপুরি লওয়া استيفاء و ايفاء ـ وفاء এসব শব্দেরও আসল অর্থ পুরাপুরি লওয়া। আরবী ভাষার সব অভিধান-গ্রন্থ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যুর সময় মানুষ নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে নেয় এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত আত্মা পুরাপুরি নিয়ে নেওয়া হয়। এ কারণে রূপক শব্দটি মৃত্যুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিদ্রা মৃত্যুর একটি হাল্কা নমুনা। কোরআনে এ অর্থেও تَوَفِّى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে----

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ـ

—আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় প্রাণ নিয়ে নেন। আর যাদের মৃত্যু আসে না, তাদের নিদ্রার সময় প্রাণ নিয়ে নেন।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া 'আল-জওয়াবুস্ সহীহ্' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

التوفى فى لغة العرب معناه القبض والاستيفاء وذلك ثلثة انواع احدها التوفى فى النوم والثانى توفى الموت والثالث توفى الروح والبدن جميعًا ـ

কুল্লিয়্যাত আবুল বাকায় বলা হয়েছে ঃ

التوفى الاماتة وقبض الروح وعليه استعمال العامة او الاستيفاء واخذ الحق وعليه استعمال البلغاء ـ

এসব কারণে আয়াতে তফসীরবিদগণ مُتَوَفِّى শব্দের অনুবাদ করেছেন পুরাপুরি লওয়া। তরজমা শায়খুল হিন্দে তাই করা হয়েছে। এ অনুবাদের দিক দিয়ে আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে এই যে, আমি আপনাকে ইহুদীদের হাতে ছেড়ে দেবো না; বরং আমি নিজেই নিয়ে নেবো। অর্থাৎ আকাশে উঠিয়ে নেবো।

কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন মৃত্যুদান করা। বয়ানুল-কোরআনের সার-ব্যাখ্যা তাই উল্লিখিত হয়েছে। এ অর্থ সুপ্রসিদ্ধ তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বর্ণিত আছে যে, আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ ইহুদীরা যখন ঈসা (আ)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সান্ত্বনার জন্য দু'টি কথা বলেন ঃ প্রথম, আপনার মৃত্যু তাদের হাতে হত্যার আকারে হবে না; বরং স্বাভাবিক মৃত্যুর আকারে হবে। দ্বিতীয়, আপাতত তাদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেবো। এটিই হযরত ইবনে-আব্বাসের তফসীর।

দুর্‌রে-মনসূর গ্রন্থে হযরত ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اخرج اسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى انى متوفيك ورافعك الى يعنى رافعك ثم متوفيك فى اخر الزمان -(درمنثور ص ٣٦ ج ٢)

অর্থাৎ হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন متوفيك ورافعك -এর অর্থ, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যমানায় স্বাভাবিক মৃত্যু দান করব।

এ তফসীরের সারমর্ম এই যে, توفى শব্দের অর্থ মৃত্যু, কিন্তু আয়াতের শব্দে رافعك প্রথমে ও متوفيك পরে হবে। এখানে متوفيك -কে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নিজের কাছে উঠিয়ে নেওয়া চিরতরে নয়; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য হবে। এরপর তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্বার অবতরণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি একাধারে একটি মু'জিযা, ঈসা (আ)-র সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণত্ব লাভ এবং খৃস্টানদের এ বিশ্বাসের খণ্ডন যে, ঈসা (আ) অন্যতম উপাস্য। নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও জোরদার হয়ে যেত যে, তিনিও আল্লাহ্ তা'আলার মতই চিরঞ্জীব এবং ভালমন্দের নিয়ামক। এ কারণে প্রথমে متوفيك বলে এসব ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এরপর নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যিকথা এই যে, কাফির ও মুশরিকরা চিরকালই পয়গম্বরগণের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলারও চিরাচরিত নীতি ছিল এই যে, যখনই কোন জাতি পয়গম্বরের বিরোধিতায় অনমনীয় হয়েছে এবং মু'জিযা দেখার পরও অস্বীকার ও অবিশ্বাস অব্যাহত রেখেছে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা আসমানী আযাব পাঠিয়ে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, যেমন আদ, সামুদ এবং সালেহ্ ও লুত পয়গম্বরের কওমের বেলায় করা হয়েছে। অথবা পয়গম্বরকেই কাফিরদের দেশ থেকে হিজরত করিয়ে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে শক্তি ও সৈন্যবল দান করে অবাধ্য কওমের বিরুদ্ধে জয়ী করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত মূসা (আ) মিসর থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আগমন করেন এবং সবশেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। অতঃপর সেখান থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে মক্কা জয় করেন। ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়াও প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার হিজরত ছিল—তারপর তিনি আবার দুনিয়াতে পদার্পণ করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে পুরাপুরি জয়লাভ করবেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ হিজরত সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আকাশের দিকেই করানো হলো কেন? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বলেন যে, ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতই।

অর্থাৎ আদম (আ) যেমন সাধারণ সৃষ্ট জীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় পিতা-মাতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমনি ঈসা (আ)-র জন্মও সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে পৃথক পন্থায় হয়েছে এবং মৃত্যুও অভিনব পন্থায় শতশত বৎসর পর জগতে পুনরাগমনের পরে হবে। সুতরাং তাঁর হিজরতও যদি ভিন্ন প্রকৃতিতে ও বিস্ময়কর পন্থায় হয়, তবে তাতে আশ্চর্য কি ?

এসব বিস্ময়কর ঘটনার কারণেই মূর্খ খৃস্টানরা ভ্রান্ত বিশ্বাসে পতিত হয়ে তাঁকে খোদা বলতে শুরু করেছে। অথচ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব ঘটনার মধ্যেই তাঁর বন্দেগী, খোদায়ী নির্দেশের আনুগত্য এবং মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই কোরআন প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের উপরোক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডনের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আকাশে উত্থিত করার ফলে তাদের বিশ্বাস খুব জোরদার হয়ে যেতো। তাই مُتَوَفِّيكَ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য ইহুদীদের মতের খণ্ডন। কারণ, তারা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করতে ও শূলে চড়াতে চেয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেন। কিন্তু শব্দ আগে-পিছে করার ফলে আলোচ্য আয়াতে খৃস্টানদের বিশ্বাসও খণ্ডন হয়ে গেছে, যে ঈসা (আ) খোদা নন যে, তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেন। এক সময় তাঁরও মৃত্যু হবে।

ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে বলেন ঃ কোরআন মজীদে এমনি ধরনের বিশেষ বিশেষ রহস্যের কারণে শব্দ আগে-পিছে করার ভূরি ভূরি নজির বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তী ঘটনাকে অগ্রে ও অগ্রবর্তী ঘটনাকে পরে বর্ণনা করা হয়েছে।—(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, ৪৮১ পৃঃ)

وَرَافِعُكَ اِلَيَّ—এতে বাহ্যত ঈসা (আ)-কেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনাকে উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, ঈসা শুধু আত্মার নাম নয় ; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের নাম। কাজেই আয়াতে দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বোঝা একেবারেই ভ্রান্তি। তবে একথা ঠিক যে, رفع শব্দটি উচ্চ মর্তবার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন—رَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ এবং يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ইত্যাদি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এটা জানা কথা যে, উচ্চ মর্তবার অর্থে رفع শব্দটির ব্যবহার একটি রূপক ব্যবহার। উল্লিখিত আয়াতসমূহে পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার ভিত্তিতে এ ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আসল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থ বোঝার কোন কারণ নেই।

এ ছাড়া আয়াতে رفع শব্দের সাথে الى ব্যবহার করার কারণে রূপক অর্থের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেছে। এ আয়াতে رَافِعُكَ اِلَيَّ এবং সূরা নিসার আয়াতেও ইহুদী-দের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন প্রসঙ্গে وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদীরা নিশ্চিতই হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। 'নিজের কাছে তুলে নেওয়া' সশরীরে তুলে নেওয়াকেই বলা হয়।

ঈসা (আ)-র সাথে আল্লাহ্র পাঁচটি অঙ্গীকার ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আ)-র সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেন।

সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তাঁর মৃত্যু ইহুদীদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না, বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রুত সময়টি কিয়ামতের নিকটতম যমানায় আসবে। তখন ঈসা (আ) আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীসে এর বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, হযরত ঈসা (আ)-কে আপাতত ঊর্ধ্বজগতে তুলে নেওয়া হবে। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়। সূরা নিসার আয়াতে এ অঙ্গীকার পূরণের সংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ নিশ্চিতই ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে। وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এ অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী (সা) আগমন করে ইহুদীদের যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন। উদাহরণত পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করার কারণে ইহুদীরা ঈসা (আ)-র জন্ম বিষয়ে অপবাদ আরোপ করতো। কোরআন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে যে, তিনি আল্লাহ্র কুদরত ও নির্দেশে পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। হযরত আদমের জন্মগ্রহণ আরো বেশী বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ, তিনি পিতা ও মাতা উভয় ব্যতিরেকেই জন্মগ্রহণ করেন।

ইহুদীরা ঈসা (আ)-র বিরুদ্ধে খোদায়ী দাবী করার অভিযোগও এনেছিল। কোরআনের অনেক আয়াতে এর বিপরীতে ঈসা (আ)-র বন্দেগী ও মানবত্বের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্গীকার وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে আপনার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে। আয়াতে

অনুসরণের অর্থ হযরত ঈসা (আ)-র নবুয়তে বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা। এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করা শর্ত নয়। এভাবে খৃস্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মুসলমানরাও ঈসা (আ)-র নবুয়তে বিশ্বাসী। এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই পরকালের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ঈসা (আ)-র যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার ওপর পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। হযরত ঈসা (আ)-র অকাট্য বিধানাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে, পরবর্তীকালে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। খৃস্টানরা এটি পালন করেনি। ফলে তারা আখিরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত। মুসলমানরা এটিও পালন করেছে। ফলে তারা পরকালের মুক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু জগতে ইহুদীদের বিপক্ষে বিজয়ী রাখার অঙ্গীকার শুধু হযরত ঈসা (আ)-র নবুয়তের ওপর নির্ভশীল ছিল। এ অঙ্গীকার অনুযায়ী ইহুদীদের বিপক্ষে খৃস্টান ও মুসলমানদের বিজয় সব সময় অর্জিত হয়েছে এবং নিশ্চিত-রূপেই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ অঙ্গীকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদী জাতির বিপক্ষে খৃস্টান ও মুসলমান জাতি সর্বদাই বিজয়ী রয়েছে। তাদের রাষ্ট্রই দুনিয়ার যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র ঃ ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র দেখে এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। কারণ প্রথমত এ রাষ্ট্রটি রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের খৃস্টানদের একটি সামরিক ছাউনি ছাড়া কিছুই নয়। তারা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। যদি একদিনের জন্যও এর মাথার উপর থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নেয়, তবে বিশ্বের মানচিত্র থেকে এর অস্তিত্ব মুছে যাওয়া সুনিশ্চিত। এ কারণে বাস্তবধর্মী লোকদের দৃষ্টিতে ইহুদী-ইসরাঈলের এ রাষ্ট্রটি একটি আশ্রিত রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কিছু নয়। যদি একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ধরেও নেওয়া হয়, তবুও খৃস্টান ও মুসলমানদের সমষ্টির বিপরীতে এ যে নেহাতই একটি অপাংক্তেয় রাষ্ট্র, তা কোন সুস্থ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে বলা যায় যে, কিয়া-মতের নিকটবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্য ইহুদীদের প্রাধান্য বিস্তারের সংবাদ স্বয়ং ইসলামী রেওয়ায়েতসমূহেই দেওয়া হয়েছে। যদি দুনিয়ার আয়ু ফুরিয়ে এসে থাকে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তবে এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইসলামী রেওয়ায়েতের পরিপন্থী নয়। এহেন ক্ষণস্থায়ী আলোড়নকে সাম্রাজ্য অথবা রাষ্ট্র বলা যায় না।

পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কিয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে। সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে যে, ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمَ بَيْنَكُمْ

হযরত ঈসা (আ)-র হায়াত ও অবতরণের প্রশ্ন ঃ জগতে একমাত্র ইহুদীরাই একথা বলে যে, ঈসা (আ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হন নি। কোরআনে সূরা নিসার আয়াতে তাদের এ ধারণার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ বাক্যাংশে এদিকে ইঙ্গিত করা

হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-র শত্রুদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে সব ইহুদী তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গৃহে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু ঈসা (আ)-র ন্যায় করে দেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন। আয়াতের ভাষা এরূপ ঃ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ

—তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলেও চড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহ্র কৌশলে তারা সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হয় এবং নিজের লোককেই হত্যা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

সূরা নিসায় এ ঘটনার আরও বিবরণ আসবে। খৃস্টানদের বক্তব্য এই যে, ঈসা (আ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে গেছেন; কিন্তু পুনর্বার তাঁকে জীবিত করে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত আয়াত তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাও খণ্ডন করে বলে যে, নিজের লোককে হত্যা করে ইহুদীদের আনন্দ-উল্লাস করতে দেখে খৃস্টানরাও ধোঁকা খেয়ে যায় যে, নিহত ব্যক্তি ঈসা (আ)-ই। অতএব ইহুদীদের ন্যায় তারাও شُبِّهَ لَهُمْ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য কতিপয় আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইহুদীদের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাঁকে হত্যা করা হয়নি এবং শূলীতে চড়ানো হয়নি। তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান আছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আকাশ থেকে অবতরণ করে ইহুদীদের বিপক্ষে জয়লাভ করবেন ; অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন।

এ বিশ্বাসের ওপর সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হজর 'তালখীস' গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এ ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।

হাফেয ইবনে-কাসীর সূরা আহযাবের وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ আয়াতের তফসীরে লিখেন ঃ

وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اماما عادلا...

অর্থাৎ এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসসমূহ 'মুতাওয়াতির' যে, তিনি কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-র একজন ন্যায়পরায়ণ নেতা হিসাবে অবতরণের সংবাদ দিয়েছেন।

এখানে আমি একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ বিষয়ে চিন্তা করলে আলোচ্য প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। তা এই যে, সূরা আলে-ইমরানের একাদশতম রুকূতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরের উল্লেখ একটিমাত্র

আয়াতে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এরপর প্রায় তিন রুকূ ও বাইশ আয়াতে হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর পরিবারের উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে, কোরআন যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁর উল্লেখও এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। হযরত ঈসা (আ)-র মাতামহীর উল্লেখ, তাঁর মানতের বর্ণনা, জননীর জন্ম, তাঁর নাম, তাঁর লালন-পালনের বিস্তারিত বিবরণ, ঈসা (আ)-র জননীর গর্ভে আগমন, অতঃপর জন্মের বিস্তারিত অবস্থা, জন্মের পর জননী কি পানাহার করলেন, শিশু সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, পরিবারের লোকদের ভর্ৎসনা, জন্মের পরপরই ঈসা (আ)-র বাকশক্তি প্রাপ্ত হওয়া, যৌবনে পদার্পণ করা, স্বজাতিকে ধর্মের প্রতি আহ্বান করা, তাদের বিরোধিতা, সহচরদের সাহায্য, ইহুদীদের ষড়যন্ত্রজাল, জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়া ইত্যাদি। এরপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে তাঁর আরও গুণাবলী, আকার-আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআন ও হাদীসে কোন পয়গম্বরের জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়টিই সকলের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এরূপ কেন এবং কোন্ রহস্যের কারণে করা হয়েছে?

সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত নবী করীম (সা) হলেন সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আগমন করবেন না। এ কারণে তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই একদিকে তিনি পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ গুণাবলীর মাধ্যমেও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাদের অনুসরণ করতে জোর তাকীদ করেছেন। অপরদিকে উম্মতের ক্ষতি সাধনকারী পথভ্রষ্ট লোকদেরও পরিচয় বলেছেন।

পরবর্তীকালে আগমনকারী পথভ্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে মসীহ্—দাজ্জাল। তার ফিত্নাই হবে অধিকতর বিভ্রান্তিকর। হযরত নবী করীম (সা) তার এত বেশী হাল-হাকীকত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার আগমনের সময় সে যে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না। এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সংস্কারক ও অনুসরণযোগ্য মনীষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন হযরত ঈসা (আ)। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত ও রিসালতের সম্মানে ভূষিত করেছেন; দাজ্জালের ফিত্নার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্য আকাশে জীবিত রেখেছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জাল-হত্যার জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। এ কারণে তাঁর জীবনালেখ্য ও গুণাবলী মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁর অবতরণের সময় তাঁকে চিনে নেওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ও ভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তাঁর পরিচয়ে জটিলতা থাকলে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন?

দ্বিতীয়, হযরত ঈসা (আ) সে সময় নবুয়ত ও রিসালতের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়ে জগতে আসবেন না ; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নবুয়তের পদ থেকে অপসারিতও হবেন না। তখন তিনি হবেন ঐ প্রাদেশিক শাসকের মত, যিনি নিজ প্রদেশের শাসক পদে অধিষ্ঠিত থেকেও প্রয়োজনবশত অন্য প্রদেশে চলে যান। তিনি এ প্রদেশে শাসক হিসাবে না এলেও নিজ প্রদেশের শাসক পদ থেকে অপসারিতও নন। মোট-কথা এই যে, হযরত ঈসা (আ) তখনও নবুয়ত ও রিসালতের গুণে গুণান্বিত হবেন। তাঁকে অস্বীকার করা পূর্বে যেরূপ কুফর ছিল, তখনও কুফর হবে। এমতাবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায়---যারা কোরআনী নির্দেশের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ---যদি অবতরণের সময় তাঁকে চিনতে না পারে, তবে অবিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাই তাঁর গুণাবলী ও লক্ষণাদি অধিক পরিমাণে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল।

তৃতীয়, ঈসা (আ)-র অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্তিম পর্যায়ে সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় তাঁর অবস্থা ও লক্ষণাদি অস্পষ্ট হলে অন্য কোন প্রতারকের পক্ষ থেকে এরূপ দাবী করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, আমিই মসীহ্ ঈসা ইবনে মারইয়াম। এখন কেউ এরূপ করলে লক্ষণাদির সাহায্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে। উদাহরণত হিন্দুস্তানে এক সময় মির্যা কাদিয়ানী দাবী করে বসে যে, সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্। মুসলমান ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার এ ভ্রান্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-র জীবনালেখ্য ও গুণাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা কিয়ামতের পূর্বক্ষণে স্বয়ং তাঁর অবতরণ ও পুনর্বার জগতে আগমনের সংবাদ দিচ্ছে।

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

(৫৬) অতএব যারা কাফির হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখিরাতে—তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৫৭) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর আল্লাহ্ অত্যাচারী-দেরকে ভালবাসেন না। (৫৮) আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই এ সমস্ত আয়াত এবং নিশ্চিত বর্ণনা।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়েছিল ঃ আমি কিয়ামতের দিন মতবিরোধকারীদের মধ্যে কার্যত মীমাংসা করে দেবো। আলোচ্য আয়াতে এ মীমাংসাই বর্ণিত হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মীমাংসার) বিবরণ এই যে, (এ সব মতবিরোধকারীর মধ্যে) যারা কাফির ছিল, তাদের (কুফরের কারণে) কঠোর শাস্তি দেব (উভয় জাহানে) দুনিয়াতেও (যা হয়ে গেছে) এবং পরকালেও (যা হবে)। তাদের কোন সাহায্যকারী (পক্ষ গ্রহণকারী) হবে না। আর যারা ঈমানদার ছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (ঈমান ও সৎকর্মের) পুরস্কার দেবেন। (কাফিরদের শাস্তিদানের কারণ এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা, (এমন) অত্যাচারীদের ভালবাসেন না (যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পয়গম্বরগণের প্রতি অবিশ্বাসী। অর্থাৎ অবিশ্বাস করা একটি বিরাট অত্যাচার —যা ক্ষমার অযোগ্য। তাই কোপে পতিত হয়ে শাস্তি লাভ করবে)। এ বিষয়টি (বর্ণিত কাহিনী) আমি আপনাকে (ওহীর সাহায্যে) পাঠ করে করে শোনাই—যা (আপনার নবুয়তের নিদর্শনাবলীর) অন্যতম নিদর্শন এবং অন্যতম রহস্যের বিষয়বস্তু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিপদাপদ মু'মিনদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ঃ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ঃ—এ আয়াতের বিষয়বস্তুতে সামান্য একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তা এই যে, কিয়ামতের মীমাংসার বর্ণনায় একথা বলার মানে কি যে, ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দেব? কারণ, তখন তো ইহকালের শাস্তি হবেই না।

এর সমাধান এই যে, এ কথাটি অপরাধীকে লক্ষ্য করে বিচারকের এরূপ উক্তির মতই যে, এখন তোমাকে এক বছর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হলে নিশ্চিতরূপেই দুই বছরের সাজা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এক বছরের সাথে অতিরিক্ত এক বছর যুক্ত হয়ে মোট দুই বছর সাজা হবে।

আলোচ্য আয়াতেও তদ্রূপ বোঝা দরকার। ইহকালের সাজা তো হয়েই গেছে। এর সাথে পরকালের সাজা যুক্ত হয়ে কিয়ামতের দিন মোট সাজা পূর্ণ করা হবে অর্থাৎ ইহকালের সাজা পরকালের সাজার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কিন্তু মু'মিনদের অবস্থা এর বিপরীত। ইহকালে তাদের ওপর কোন বিপদাপদ এলে গোনাহ্ মাফ হয় এবং পরকালের দণ্ড লঘু অথবা রহিত হয়। সে কারণেই لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মু'মিনগণ ঈমানের কারণে আল্লাহ্র প্রিয়। প্রিয়জনের সাথে এমনি ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে কাফিররা কুফরের কারণে আল্লাহ্র ঘৃণার পাত্র। ঘৃণিতদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয় না।—(বয়ানুল কোরআন)

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ
لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا
نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ
الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

(৫৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাঁকে বলেছিলেন—হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। (৬০) যা তোমার পালনকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। (৬১) অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাবার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল ঃ "এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত করি, যারা মিথ্যাবাদী।" (৬২) নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ভাষণ। আর এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই। আর আল্লাহ্‌ ; তিনিই হলেন পরাক্রমশালী, মহাপ্রাজ্ঞ। (৬৩) তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে, তাহলে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ্‌ জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় হযরত ঈসা (আ)-র বিস্ময়কর অবস্থা আল্লাহ্‌র কাছে (অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে) হযরত আদম (আ)-এর (বিস্ময়কর অবস্থার) অনুরূপ। তিনি তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। এবং তাকে (অর্থাৎ আদমের কাঠামোকে) আদেশ করেছেন ঃ (প্রাণী) হয়ে যা। এতে সে (প্রাণী) হয়ে গেল। এ বাস্তব ঘটনা (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (বর্ণিত হয়েছে)। অতএব, আপনি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। অনন্তর আপনার কাছে যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও ঈসা (আ) সম্পর্কে কেউ আপনার সাথে বাদানুবাদ করলে আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ

(আচ্ছা, যদি যুক্তি-প্রমাণে কাজ না হয়, তবে) এস আমরা (ও তোমরা) ডেকে নিই আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের এবং স্বয়ং আমাদের ও তোমাদের। অতঃপর আমরা (সবাই মিলে মনে প্রাণে) প্রার্থনা করি যে, (এ আলোচনায়) যারা অসত্যপন্থী, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হোক। নিশ্চয় এটাই (অর্থাৎ যা বর্ণিত হয়েছে) সত্য বিবরণ। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই (এটা সত্তাগত তওহীদ)। আল্লাহ্ তা'আলাই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ (এটা গুণগত তওহীদ)। অতঃপর (এ সব প্রমাণের পরেও) যদি (সত্য গ্রহণে) তারা বিমুখ হয়, তবে (আপনি তাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র দরবারে সমর্পণ করুন। কেননা,) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা দুষ্কৃতকারীদের সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিয়াসের প্রামাণ্যতা ঃ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়াসও শরীয়তসম্মত প্রমাণ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ ঈসা (আ)-র জন্ম আদমের জন্মের অনুরূপ। অর্থাৎ আদম (আ)-কে যেমন জনক (ও জননী) ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসা (আ)-কেও তদ্রূপ জনক ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-র সৃষ্টিকে আদম (আ)-এর সৃষ্টির ওপর কিয়াস করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।—(মাযহারী)

মুবাহালার সংজ্ঞা ঃ ..... فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-কে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালার সংজ্ঞা এই ঃ যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়ার মানেই খোদায়ী ক্রোধের নিকটবর্তী হওয়া। এর সার-মর্ম দাঁড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হোক। এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। সে সময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্র করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্র করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

মুবাহালার ঘটনা ঃ এর পটভূমিকা এই যে, মহানবী (সা) নাজরানের খৃস্টানদের কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয় ঃ (১) ইসলাম কবূল কর, (২) অথবা জিযিয়া কর দাও, (৩) অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। খৃস্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শোরাহ্‌বিল, আবদুল্লাহ্ ইবনে শোরাহ্‌বিল ও জিবার ইবনে ফয়েযকে হুযুর (সা)-এর কাছে প্রেরণ করে। তারা এসে

ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আ)-কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্য প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুবাহালার উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে রসূলে খোদা (সা) প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার প্রতি আহ্বান জানান এবং নিজেও হযরত ফাতিমা (রা), হযরত আলী (রা) এবং ইমাম হাসান (রা) ও হোসাইন (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শোরাহ্বিল ভীত হয়ে যায় এবং সাথীদ্বয়কে বলতে থাকে ঃ তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহ্র নবী। আল্লাহ্র নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির অন্য কোন পথ খোঁজ। সঙ্গীদ্বয় বলল ঃ তোমার মতে মুক্তির উপায় কি ? সে বলল ঃ আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধিদল সম্মত হয় এবং মহানবী (সা) তাদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন।---(ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড)

আলোচ্য আয়াতে أَبْنَاءَنَا শব্দের অর্থ শুধু ঔরসজাত সন্তানই নয়, বরং ঔরসজাত সন্তান এবং সন্তানের সন্তানও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সাধারণ পরিভাষায় এদের সবাইকে সন্তানই বলা হয়। সেমতে أَبْنَاءَنَا শব্দের মধ্যেই মহানবী (সা)-র প্রিয়তম দৌহিত্রদ্বয় ইমাম হাসান (রা) ও হোসাইন (রা) এবং হযরত আলী (রা) অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষত হযরত আলী (রা)-কে أَبْنَاءَنَا -এর অন্তর্ভুক্ত করা এ কারণেও শুদ্ধ যে, তিনি হযরত (সা)-এর কোলেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তিনি সন্তানের মতই তাঁকে লালন-পালন করেন। এরূপ পালিত শিশুকেও সাধারণ পরিভাষায় সন্তান বলা হয়।

এ বর্ণনা থেকে বোঝা গেল যে, হযরত আলী (রা) আওলাদ তথা সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাফেযী সম্প্রদায় তাঁকে أبناء نا থেকে বহিষ্কার করে أنفسنا -এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে এবং এর দ্বারা হযরত (সা)-এর পরেই তাঁর খিলাফত প্রমাণ করে। উপরোক্ত বর্ণনাদৃষ্টে রাফেযীদের এ যুক্তি শুদ্ধ নয়।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

(৬৪) বলুন ঃ "হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস—যা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কেউ কাউকে পালনকর্তা বানাব না।" তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক, আমরা তো অনুগত।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ [সা]) আপনি বলে দিন ঃ হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা এমন একটি বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান (ভাবে স্বীকৃত)। তা এই যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আমরা কারও ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য কাউকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবে না। অতঃপর যদি (এর পরেও) তারা (সত্য থেকে) বিমুখ হয়, তবে তোমরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) বলে দাও ঃ তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (এ বিষয়ের) অনুগত (তোমরা অনুগত না হলে তোমরা জান)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তবলীগের মূলনীতি ঃ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ---এ আয়াত থেকে তবলীগ ও ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। তা এই যে, ভিন্ন মতাবলম্বী কোন দলকে ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে হলে প্রথম তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহবান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন রোম সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিষয়ের প্রতি আহ্‌বান জানান, যাতে উভয়েই একমত ছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব-বাদের প্রতি। আমন্ত্রণলিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى - امّا بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم اليريسيين - يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله -(البخارى)

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি—যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। এ পত্র আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি

আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাই। মুসলমান হয়ে যান; শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি বিমুখ হন তবে আপনার প্রজা-সাধারণের গোনাহ্ আপনার উপর পতিত হবে। হে আহলে-কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে অংশীদার করবো না এবং আল্লাহ্কে ছেড়ে একে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবো না।

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ—এ আয়াতে 'সাক্ষী থাক' বলে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যুক্তি-প্রমাণ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হওয়ার পরেও সত্যকে স্বীকার না করলে স্বীয় মতাদর্শ প্রকাশ করে বিতর্কে ইতি টানা উচিত—অধিক আলোচনা ও কথা কাটাকাটি সমীচীন নয়।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ
وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ
حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا
نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ
آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

(৬৫) হে আহলে-কিতাবগণ! কেন তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তওরাত ও ইনজীল তাঁর পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বুঝ না? (৬৬) শোন! ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তাই নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ? আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নহ। (৬৭) ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' অর্থাৎ সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। (৬৮) মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম—আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মু'মিনদের বন্ধু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আহলে-কিতাবগণ! (হযরত) ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে কেন বাদানুবাদ কর (যে, তিনি ইহুদী মতাবলম্বী ছিলেন অথবা খৃস্টীয় মতাবলম্বী ছিলেন)? অথচ তওরাত ও ইন্‌জীল তাঁর (আমলের) পরেই অবতীর্ণ হয়েছে। (এ উভয় ধর্মমত এ দুটি ধর্মগ্রন্থ অবতরণের পর থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে। পূর্ব থেকে এদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত ইবরাহীম (আ) এ দুই ধর্মমতের যে কোন একটি কিরূপে অবলম্বন করতে পারেন? এমন যে নির্বোধ কথাবার্তা বল,) তোমরা কি কিছুই বুঝ না? তোমরা এমন যে, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল, সে বিষয়ে ইতি-পূর্বে বাদানুবাদ করেছ (যদিও তাতে একটি ভ্রান্ত উক্তি সংযোজন করে তার মধ্য থেকে ভ্রান্ত ফলাফল বের করেছিলে। অর্থাৎ তোমরা ঈসা [আ]-র অলৌকিক কার্যাবলী সম্পর্কে দাবী করত যে, এগুলো বাস্তবের অনুরূপ। কিন্তু এর সাথে একটি ভ্রান্ত বাক্যও সংযোজিত করে বলত যে, এরূপ অলৌকিক কার্যাবলীর অধিকারী ব্যক্তি উপাস্য হবে কিংবা উপাস্যের পুত্র হবে। এতে একটি সন্দেহযুক্ত বাক্য থাকার কারণে একে অসম্পূর্ণ জ্ঞান বলাই যথার্থ হবে; এতে যখন তোমাদের ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে,) অতএব যে বিষয়ে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেন বাদানুবাদ করছ? (কেননা, এরূপ দাবী করার পক্ষে সন্দেহের উদ্রেক করে, এমন কোন উপকরণও তোমাদের কাছে নেই। কারণ, তোমাদের মধ্যেও ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়তে প্রচলিত বিধি-বিধানের কোনরূপ মিল নেই)। আল্লাহ্ তা'আলা (ইবরাহীম [আ]-এর ধর্মমত) জানেন, তোমরা জান না। (এখন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর ধর্মমত শুনে নাও যে,) ইবরাহীম (আ) ইহুদী ছিলেন না এবং খৃস্টানও ছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন অভ্রান্ত সরল পথের অনুসারী (অর্থাৎ) মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (অতএব, ধর্মমতের দিক দিয়ে তাঁর সাথে ইহুদী ও খৃস্টানদের কোনই সম্পর্ক নেই; তবে) নিশ্চয় ইবরাহীম (আ)-এর সাথে অধিক সম্পর্কশীল তারা, যারা সে সময়ে তাঁর অনুসরণ করেছিল, অতঃপর এ নবী (মুহাম্মদ [সা] ও মু'মিনগণ (যারা মুহাম্মদ [সা]-এর উম্মত)। আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক (অর্থাৎ তাদের ঈমানের প্রতিদান দেবেন)।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۭ وَمَا يُضِلُّوْنَ
اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

(৬৯) কোন কোন আহলে-কিতাবের আকাঙ্ক্ষা, যাতে তোমাদের গোমরাহ করতে পারে, কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই গোমরাহ করে না। অথচ তারা বুঝতে পারে না। (৭০) হে আহলে-কিতাবগণ! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র কালামকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরাই তাঁর প্রবক্তা? (৭১) হে আহলে-কিতাবগণ! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আহলে-কিতাবদের মধ্যে একদল লোক মনে প্রাণে কামনা করে যাতে (সত্য ধর্ম থেকে) তোমাদের পথভ্রষ্ট করে দিতে পারে। তারা পথভ্রষ্ট করতে তো পারবেই না; বরঞ্চ নিজকেই (পথভ্রষ্ট করার দুর্ভাগ্যে জড়িত করছে); কিন্তু তারা বুঝছে না। হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! তোমরা কেন আল্লাহ্ তা'আলার (ঐ) নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছ, (যা তওরাত ও ইন্‌জীলে মুহাম্মদ [সা]-এর নবুয়ত প্রমাণ করে। কেননা, তাঁর নবুয়ত স্বীকার না করার অর্থ এ সব নিদর্শনকে মিথ্যা বলা। এটাই কুফরী তথা অবিশ্বাস করা)। অথচ তোমরা (নিজ মুখে) স্বীকারোক্তি করে থাক যে, সেসব নিদর্শন সত্য। (পরবর্তী আয়াতে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে ভর্ৎসনা করে বলেন): হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা কেন সত্য (বিষয়কে অর্থাৎ মুহাম্মদ [সা]-এর নবুয়তকে) মিথ্যার সাথে (অর্থাৎ বিকৃত বাক্যাবলী অথবা ভ্রান্ত ব্যাখ্যার সাথে) সংমিশ্রিত করছ এবং (কেন) সত্যকে গোপন করছ? অথচ তোমরা জান (যে, প্রকৃত সত্য তোমরা গোপন করে চলেছ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ও أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, তারা সত্যের স্বীকারোক্তি না করলে অথবা তাদের জানা না থাকলে অবিশ্বাস করা বৈধ হবে। কারণ এই যে, কুফরী তথা অবিশ্বাস এমনিতেই একটি মন্দ কাজ। এটা সর্বাবস্থায় অবৈধ। তবে জানা স্বীকারোক্তির পর কুফর করলে তা অধিকতর তিরস্কার ও ধিক্কারের যোগ্য।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا
اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ۭ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ
مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاۗجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۭ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ

اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ
يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

(৭২) আর আহলে-কিতাবগণের একদল বললো, মুসলমানগণের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার কর, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। (৭৩) যারা তোমাদের ধর্মমতে চলবে, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। বলে দিন, নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ্ করেন। আর এ সব কিছু এ জন্য যে, তোমরা যা লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে, কিংবা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের ওপর তারা কেন প্রবল হয়ে যাবে! বলে দিন, মর্যাদা আল্লাহ্রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। (৭৪) তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আহ্লে-কিতাবদের কিছু লোক (পারস্পরিক পরামর্শক্রমে) বললো ঃ (মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করার একটি কৌশল আছে; তা হলো এই যে, রসূল [সা]-এর মাধ্যমে) মুসলমানদের প্রতি যে গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরআন) অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি দিনের শুরুতে (অর্থাৎ সকাল বেলায়) বিশ্বাস স্থাপন কর এবং দিনের শেষে (অর্থাৎ অপরাহ্নে) অবিশ্বাস করে বস। হতে পারে (এ কৌশলের ফলে কোরআন ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধবে এবং) তারা (স্বীয় ধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে। (তারা মনে করবে যে, এরা বিদ্বান---তদুপরি বিদ্বেষমুক্ত, নতুবা ইসলাম গ্রহণ করতো না---তা সত্ত্বেও তারা যখন ইসলাম ত্যাগ করেছে, তখন নিশ্চয়ই কোন যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেই করেছে। এখন তারা ইসলামে কোন দোষ দেখেই তা ত্যাগ করেছে। আহলে-কিতাবগণ পরস্পর আরও বললো ঃ তোমরা মুসলমানদের দেখানোর উদ্দেশ্যে শুধু বাহ্যিক বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আন্তরিকতার সাথে) কারও সামনে (এ ধর্মের) স্বীকারোক্তি করবে না। তবে যে ব্যক্তি তোমাদের ধর্মের অনুসারী হয়, (তার সামনে আন্তরিকভাবে নিজেদের ধর্মের স্বীকারোক্তি করা দরকার। কিন্তু মুসলমানদের সামনে মৌখিক স্বীকারোক্তি করে নেবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কৌশলের ব্যর্থতা প্রকাশ করে বলেন ঃ হে মুহাম্মদ!) বলে দিন, (এ সব চালাকিতে কিছুই হবে না। কারণ,) নিশ্চয় (বান্দাদের যে) হেদায়েত, (তা) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়েত (হয়ে থাকে)। সুতরাং হেদায়েত যখন আল্লাহ্র করায়ত্ত, (তখন তিনি যাকে হেদায়েতের ওপর কায়েম রাখতে চাইবেন, তাকে কেউ কৌশলে বিচ্যুত করতে পারবে না। পরবর্তী আয়াতে তাদের এ পরামর্শ ও কৌশলের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা এ কারণে এসব কথাবার্তা বলছ যে,) অন্য কেউ এমন

বস্তু লাভ করছে, যা তোমরা লাভ করেছিলে (অর্থাৎ খোদায়ী গ্রন্থ ও খোদায়ী ধর্ম। অথবা সে তোমাদের পালনকর্তার সম্মুখে তোমাদের বিপক্ষে জয়ী হয়ে যাবে। সার-কথা এই যে, মুসলমানরা খোদায়ী গ্রন্থ লাভ করেছে---এ জন্য তোমরা তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করছ অথবা তারা ধর্মীয় বিতর্কে তোমাদের বিপক্ষে কেন জয়ী হয়ে যায়, এ হিংসার কারণে তোমরা ইসলাম ও মুসলমানদের অবনতির জন্য সচেষ্ট থাকছ। পরবর্তী আয়াতে এ হিংসা খণ্ডন করা হয়েছে। হে মুহাম্মদ!) বলে দিন ঃ গৌরব আল্লাহ্ তা'আলারই করায়ত্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ্ খুবই প্রাচুর্যময়, (তাঁর কাছে গৌরবের অভাব নেই,) অত্যন্ত জ্ঞানী (কখন কাকে দিতে হবে, তা জানেন)। তিনি স্বীয় করুণার (ও গৌরবের) সাথে যাকে ইচ্ছা তা নির্দিষ্ট করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা মহান গৌরবশালী। (এখন অভিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বীয় করুণা ও গৌরব মুসলমানদের দান করেছেন। এতে হিংসা করা অনর্থক)।

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ
إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

(৭৫) কোন কোন আহলে-কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তাদের মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে! এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, উম্মীদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জেনে শুনেই মিথ্যা বলে।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের ধর্মীয় ব্যাপারে বিশ্বাস-ঘাতকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করা, সত্য ও মিথ্যাকে সংমিশ্রিত করা, সত্য গোপন করা এবং মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করার কৌশল উদ্ভাবন করা। আলোচ্য আয়াতে তাদের অর্থ-সম্পদে বিশ্বাসঘাতকতার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক আমানতদারও ছিল। এ কারণে তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আহলে-কিতাবদের কেউ কেউ এমন যে, যদি তুমি তার কাছে রাশি রাশি ধনও

গচ্ছিত রাখ, তবে সে (চাওয়া মাত্র) তোমাকে প্রত্যর্পণ করবে। আবার তাদের কেউ কেউ এমন যে, যদি তুমি তার কাছে একটি দীনারও গচ্ছিত রাখ, তবে সে তাও তোমাকে প্রত্যর্পণ করবে না (বরং আমানত রাখার কথাই স্বীকার করবে না)—যে পর্যন্ত তুমি (আমানত রেখে) তার মাথার ওপর (সব সময়) দণ্ডায়মান না থাক। (দণ্ডায়মান থাকা পর্যন্ত অস্বীকার করবে না, কিন্তু একটু সরে গেলেই প্রত্যর্পণ করা তো দূরের কথা, আমানতই অস্বীকার করে বসবে)। এটা (গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ না করা) এ কারণে যে, তারা বলে ঃ আমাদের ওপর আহলে-কিতাবভুক্তদের ছাড়া অন্যদের (অর্থ) সম্পদ (গোপনে) গ্রহণ করলে (ধর্মত) কোন অভিযোগ নেই (অর্থাৎ কিতাবী ধর্ম-বহির্ভূত—যেমন কুরায়শদের অর্থ-সম্পদ চুরি করা অথবা ছিনিয়ে নেওয়া সবই বৈধ। আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে তাদের এ দাবীকে মিথ্যা বলছেন) তারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে (যে, এ কাজটি হালাল)। অথচ মনে মনে তারাও জানে (যে, আল্লাহ্ এ কাজকে হালাল করেন নি; বরং এটা তাদের মনগড়া দাবী)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অমুসলমানের উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা করা বৈধ ঃ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ এ আয়াতে কিছু সংখ্যক লোকের আমানতে বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে প্রশংসা করা হয়েছে। আয়াতে "কিছু সংখ্যক লোক" বলে যদি ঐসব আহলে-কিতাবকে বোঝানো হয়ে থাকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে এ প্রশংসায় কোনরূপ জটিলতা নেই। কিন্তু যদি সাধারণ আহলে-কিতাব বোঝানো হয়ে থাকে, যারা অ-মুসলিম, তবে প্রশ্ন হয় যে, কাফিরের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়; এমতাবস্থায় তার প্রশংসার অর্থ কি?

উত্তর এই যে, প্রশংসা করলেই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া বোঝায় না। এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল কাজ কাফিরের হলেও তা এক পর্যায়ে ভালই। সে এর উপকার দুনিয়াতে সুখ্যাতির আকারে এবং আখিরাতে শাস্তি হ্রাসের আকারে পাবে।

এ বর্ণনায় একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা নেই, বরং সে খোলা মনে প্রতিপক্ষের সদ্‌গুণাবলীরও প্রশংসা করে।

اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا—এ আয়াত দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রমাণ করেছেন যে, ঋণদাতা ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার পিছু লেগে থাকার অধিকার তার রয়েছে। —(কুরতুবী, ৪র্থ খণ্ড)

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ

يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ
لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

(৭৬) হ্যাঁ, যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহিযগার হবে, তা'হলে আল্লাহ্ পরহিযগারদেরকে ভালবাসেন। (৭৭) যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

যোগসূত্র ঃ পূর্বের আয়াতে ويقولون থেকে আহ্লে-কিতাবদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে একেই জোরদার করা হয়েছে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অঙ্গীকার পালনের ফযীলত বর্ণনা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের নিন্দা করা হয়েছে!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে) অভিযোগ কেন হবে না; (অবশ্যই হবে। কেননা, তাদের সম্পর্কে আমার দুটি আইন রয়েছে। এক ঃ) যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার (আল্লাহ্ তা'আলার সাথে হোক কিংবা তাঁর সৃষ্টির সাথে হোক) পূর্ণ করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ (এমন) আল্লাহ্ভীরুদের পছন্দ করেন। (দুই) নিশ্চয় যারা ঐ অঙ্গীকারের বিনিময়ে মূল্য (জাগতিক উপকার) গ্রহণ করে, যা (তারা) আল্লাহ্র সাথে করেছে। (উদাহরণত পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা) এবং স্বীয় শপথের বিনিময়ে (উদাহণরত বান্দার হক ও লেন-দেনের ব্যাপারে শপথ করা) পরকালে তাদের কোন অংশ (সেখানকার নিয়ামতের মধ্যে) নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে (অনুকম্পাসূচক) কথাবার্তা বলবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) দেখবেন না এবং কিয়ামতের দিন (পাপ থেকে) তাদের মুক্ত করবেন না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী ঃ উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হয় এবং যা পূর্ণ করা উভয় পক্ষের জন্য জরুরী, এমন বিষয়কে অঙ্গীকার বলা হয়। ওয়াদা শুধু এক পক্ষ থেকে হয়। অতএব, অঙ্গীকার ব্যাপক এবং ওয়াদা সীমিত।

কোরআন ও সুন্নায় অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত ৭৭তম আয়াতেও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ

১. জান্নাতের নিয়ামতসমূহে তার কোন অংশ নেই। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের অধিকার নষ্ট করে, সে নিজের জন্য দোযখের শাস্তিকে অপরিহার্য করে নেয়। বর্ণনাকারী আরয করলেন ঃ যদি বিষয়টি সামান্য হয় তবুও কি দোযখ অপরিহার্য হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তা গাছের একটা তাজা ডালই হোক না কেন। ---(মুসলিম)

২. আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না।

৩. কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না।

৪. আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা, অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বান্দার হক নষ্ট হয়েছে। বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ্ মার্জনা করেন না।

৫. তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে।

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَٰبِ
وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَٰبِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ
اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن
يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّٰنِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ
الْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَٰٓئِكَةَ
وَالنَّبِيِّۦنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

(৭৮) আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করেছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহ্র তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটা আল্লাহ্রই কথা, অথচ তা আল্লাহ্র কথা নয়। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্রই প্রতি মিথ্যারোপ করে। (৭৯) কোন মানুষকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করার

পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'—এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শেখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।' (৮০) তাছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরী শেখাবে ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় তাদের মধ্যে আছে, যারা স্বীয় জিহ্বাকে বাঁকিয়ে গ্রন্থ পাঠ করে (অর্থাৎ এতে কোন শব্দ অথবা ভ্রান্ত তফসীর যুক্ত করে দেয়। সাধারণত ভুল পাঠকারীকে বক্রভাষী বলা হয়) ---যাতে তোমরা (যারা শোন) একেও (অর্থাৎ যা সংযুক্ত করা হয়েছে সেগুলোকেও) গ্রন্থের অংশ মনে কর। অথচ তা গ্রন্থের অংশ নয় এবং (শুধু ধোঁকা দেওয়ার জন্য এ পন্থাকেই যথেষ্ট মনে করে না ; বরং মুখেও) বলে যে, এটা (শব্দ অথবা তফসীর) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (যে শব্দ ও নিয়ম-কানূন অবতীর্ণ হয়েছে, তা দ্বারা প্রমাণিত)। অথচ তা (কোনরূপেই) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। (সুতরাং তা মিথ্যা। পরবর্তী আয়াতে আরও জোর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে), তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তারা (যে মিথ্যাবাদী, তা তারাও মনে মনে) জানে। কোন মানবের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ (তো) তাকে গ্রন্থ, (ধর্মের) জ্ঞান এবং নবুয়ত দান করবেন, (এদের প্রত্যেকটির দাবী হচ্ছে কুফর ও শিরককে বাধা দান) আর সে মানুষকে বলবেঃ আমার বান্দা (অর্থাৎ ইবাদতকারী) হয়ে যাও আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ তাঁর একত্ববাদকে) ছেড়ে। (অর্থাৎ নবুয়ত ও শিরকের প্রতি প্ররোচনা দানে একত্রিত হওয়া অসম্ভব)। কিন্তু (সেই নবী একথা বলবেন যে) তোমরা আল্লাহ্-ভক্ত হয়ে যাও (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর)। কারণ, তোমরা খোদায়ী গ্রন্থ (অন্যকেও) শিক্ষা দাও এবং (নিজেরাও) পাঠ কর (এতে একত্ববাদের শিক্ষা রয়েছে)। আর (সেই নবুয়তের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি একথা আদেশ করবেন না যে, তোমরা ফেরেশতাদেরকে ও পয়গম্বরগণকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমরা (এ বিশেষ বিশ্বাসে বাস্তবে অথবা স্বীয় দাবীতে) মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদের কুফরী করার কথা বলতে পারে ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার একটি যুক্তিঃ مَا كَانَ لِبَشَرٍ নাজরানের প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে কোন কোন ইহুদী ও খৃস্টান বলেছিলঃ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার তেমনি উপাসনা করি, যেমন খৃস্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়ামের উপাসনা করে? হযরত (সা) বলেছিলেনঃ (মাআযাল্লাহ্) এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করি অথবা অপরকে এর প্রতি

আহবান জানাই? আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন নি। এ কথোপ-কথনের পরই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা মানবকে কিতাব, হিকমত ও পয়-গম্বরের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে সরিয়ে স্বয়ং নিজের অথবা অন্য কোন সৃষ্ট জীবের দাসে পরিণত করার চেষ্টা পয়গম্বরের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, এর অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্ যাকে যে পদের যোগ্য মনে করে প্রেরণ করেন, সে বাস্তবে সেই কাজের যোগ্য নয়। জগতের কোন সরকার কোন ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করার পূর্বে দুটি বিষয় চিন্তা করে নেয়ঃ

(১) লোকটি সরকারের নীতি বোঝার ও স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা রাখে কি না?

(২) সরকারী আদেশ পালন ও জনগণকে সরকারের আনুগত্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখার ব্যাপারে তার কাছ থেকে কতটুকু দায়িত্ববোধ আশা করা যায়? যার সম্পর্কে বিদ্রোহ অথবা সরকারী নীতি লংঘনের সামান্যতম সন্দেহ থাকে, তাকে কোন সর-কারই প্রতিনিধি বা দূত নিযুক্ত করতে পারে না। তবে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা ও আনু-গত্যের সঠিক পরিমাপ করা জাগতিক সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বেলায় এরূপ সম্ভাবনা নেই। যদি কোন মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ্র এরূপ জ্ঞান থাকে যে, সে খোদায়ী আনুগত্যের সীমা চুল পরিমাণও লংঘন করবে না, তবে, পরে এর ব্যতিক্রম হওয়া একেবারেই অসম্ভব। নতুবা আল্লাহ্র জ্ঞান ভ্রান্ত হয়ে যাবে (নাউযুবিল্লাহ্)। এখান থেকেই পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব, পয়গম্বরগণ যখন সামান্যতম অবাধ্যতা থেকেও পবিত্র, তখন শিরক তথা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা কোথায় অবশিষ্ট থাকে?

খৃস্টানরা বলে যে, ঈসা ইবনে মারইয়ামের উপাস্য হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং ঈসা (আ) তাদের শিক্ষা দিয়েছেন। উপরোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এ দাবী অসার প্রমাণিত হয়। কোন কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করেছিল ঃ আমরা সালামের পরিবর্তে আপনাকে সিজদা করলে ক্ষতি কি? আয়াতে তাদের ভ্রান্তিও ফুটে উঠলো। এ ছাড়া আয়াতে আহ্লে-কিতাবদের ভ্রান্তির প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ হয়েছে, যারা পাদ্রী ও সন্ন্যাসীদের আল্লাহ্র স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল (নাউযুবিল্লাহ্)।

—(ফাওয়ায়েদে-উসমানী)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ

فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ اٰمَنَّا
بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ
رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾

(৮১) আর আল্লাহ্ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, 'আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেওয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি অঙ্গীকার করছ এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ?' তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করছি।' তিনি বললেন, 'তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম!' (৮২) অতঃপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে, সেই হলো নাফরমান। (৮৩) তারা কি আল্লাহ্‌র দীনের পরিবর্তে অন্য দীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। (৮৪) বলুন, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমার উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর আর যা কিছু পেয়েছেন মূসা ও ঈসা এবং অন্য সমস্ত নবী-রসূল তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁর অনুগত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টি স্মরণযোগ্য,) যখন আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেন যে, আমি তোমাদের যা কিছু গ্রন্থ ও (শরীয়তের) জ্ঞান দান করি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে, তার সত্যায়নকারী (অন্য) পয়গম্বর আগমন করেন, (অর্থাৎ শরীয়তের নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তাঁর রিসালত প্রমাণিত হয়, তখন আপনারা অবশ্য তাঁর (রিসালতের) প্রতি (আন্তরিক) বিশ্বাস স্থাপন করবেন এবং (বাস্তব ক্ষেত্রে) তাঁর সাহায্যও করবেন। (এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পর) তিনি বলেন : আপনারা কি এতে স্বীকৃত হলেন এবং আমার শর্ত গ্রহণ করলেন? তাঁরা বললেন :

আমরা স্বীকার করলাম। (আল্লাহ্) বললেন ঃ তবে আপনারা (এ স্বীকৃতির ওপর) সাক্ষী থাকুন। (কেননা, সাক্ষ্যের বিপরীত করাকে সবাই সর্বাবস্থায় খারাপ মনে করে। কিন্তু স্বীকারোক্তির বিপরীত করা তেমন অকল্পনীয় নয়। কারণ, স্বীকারোক্তিকারী স্বার্থ প্রণোদিতও হতে পারে। সেমতে আপনারা শুধু স্বীকারোক্তিকারী হিসাবে নয় ; সাক্ষী হিসাবে এতে অটল থাকবেন)। আমিও আপনাদের সাথে অন্যতম) সাক্ষী (অর্থাৎ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত) রইলাম। অতএব, (উম্মতদের মধ্যে) যে ব্যক্তি (এ অঙ্গীকার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে-ই (পুরাপুরি) অবাধ্য (অর্থাৎ) কাফির। যে ইসলামের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে, তা থেকে মুখ (ফিরিয়ে) তারা কি আল্লাহ্র ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার (নির্দেশের) সামনে মাথা নত করেছে (কেউ) ইচ্ছায় (কেউ) অনিচ্ছায়। (এ মাহাত্ম্যের দিকে লক্ষ্য করে তাঁর অঙ্গীকারের বিরোধিতা করা উচিত নয়। বিশেষ করে যখন ভবিষ্যতে শাস্তিরও আশংকা রয়েছে। সে মতে সবাই আল্লাহ্র দিকে (কিয়ামতের দিন) প্রত্যাবর্তিত হবে। (তখন বিরুদ্ধাচরণকারীদের শাস্তি দেওয়া হবে। (হে মুহাম্মদ! আপনি ইসলাম ধর্ম প্রকাশের সারমর্ম হিসাবে একথা) বলে দিন ঃ আমরা আল্লাহ্র প্রতি, ঐ নির্দেশের প্রতি, যা আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছে, ঐ নির্দেশের প্রতি যা (হযরত) ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইয়াকুব (আ) ও তৎবংশীয় (নবী)-গণের প্রতি প্রেরিত হয়েছে। এবং ঐ নির্দেশ ও মু'জিযার প্রতি, যা (হযরত) মূসা ও ঈসা (আ) এবং অন্যান্য পয়গম্বরকে দান করা হয়েছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (বিশ্বাসও এমন যে) আমরা তাদের মধ্য থেকে (কোন একজনের ব্যাপারেও) বিশ্বাসের কোন পার্থক্য করি না (যে, একজনকে বিশ্বাস করবো আরেকজনকে বিশ্বাস করবো না) আমরা আল্লাহ্ তা'আলারই অনুগত, (তিনিই আমাদের ধর্ম বলে দিয়েছেন, আমরা তা গ্রহণ করেছি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্ তা'আলার তিনটি অঙ্গীকার ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কাছ থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। একটি সূরা আ'রাফের أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও রবুবিয়াতে বিশ্বাসী হবে। কেননা, ধর্মের গোটা প্রাচীর এ ভিত্তির ওপরই নির্মিত। এ বিশ্বাস না থাকলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিবেক ও চিন্তার পথ প্রদর্শন কোন উপকারেই আসে না। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আরও আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। অঙ্গীকার শুধু আহলে-কিতাব আলিমদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সত্য গোপন না করে।

তৃতীয় অঙ্গীকার আলোচ্য আয়াত وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ এ উল্লিখিত হয়েছে। এর বিবরণ পরে আসবে। —(তফসীরে আহমদী)

مِيْثَاق-এর অর্থ কি এবং তা কোথায় নেওয়া হয়েছে ঃ এ অঙ্গীকার আত্মার জগতে অথবা পৃথিবীতে ওহীর মাধ্যমে নেয়া হয়েছে। —(বয়ানুল কোরআন)

কি অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, তা কোরআনেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কি সম্পর্কে নেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত আলী (রা) ও হযরত ইবনে-আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সব পয়গম্বরের কাছ থেকে মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে অঙ্গীকার নেন যে, তাঁরা স্বয়ং যদি তাঁর আমলে জীবিত থাকেন, তবে যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁর সাহায্য করেন। স্বীয় উম্মতকেও যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান।

হযরত তাউস, হাসান বসরী, কাতাদাহ্ প্রমুখ মনীষী বলেন ঃ পয়গম্বরগণের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, যাতে তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন। —(তফসীরে ইবনে-কাসীর)

নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা শেষোক্ত উক্তির সমর্থন হতে পারে—وَاِذْ اَخَذْنَا

مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝ (الاحزاب)

কেননা, এ অঙ্গীকার একে অন্যের সাহায্য ও সমর্থনর জন্য নেওয়া হয়েছিল। —(তফসীরে-আহ্মদী)

উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ কারণে আয়াতের অর্থ উভয়টিই হতে পারে। —(ইবনে কাসীর)

পয়গম্বরগণকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলার উপকারিতা ঃ এখানে বাহ্যত প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। তিনি ভালরূপেই জানেন যে, মুহাম্মদ (সা) অন্য কোন নবীর উপস্থিতিতে পৃথিবীতে আগমন করবেন না। এমতাবস্থায় তাঁর প্রতি পয়গম্বরগণের বিশ্বাস স্থাপনের উপকারিতা কি ?

একটু চিন্তা করলেই সুস্পষ্ট উপকারিতা বোঝা যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী যখন তাঁরা হযরত (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সংকল্প করবেন, তখন থেকেই সওয়াব পেতে থাকবেন। —(সাভী)

মহানবী (সা)-র বিশ্বজনীন নবুয়ত وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ

আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব পয়গম্বরের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, আপনাদের মধ্য থেকে কোন পয়গম্বরের পর যখন অন্য পয়গম্বর আগমন করেন—যিনি অবশ্যই পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও খোদায়ী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী হবেন, তখন পূর্ববর্তী নবীর জন্য জরুরী হবে নতুন নবীর সত্যতা ও নবুয়তের প্রতি নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্যকেও বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। কোর-আনের এ সামগ্রিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কেও এমনি ধরনের অঙ্গীকার পয়গম্বরগণের কাছ থেকে নিয়ে থাকবেন। আল্লামা সুবকী স্বীয় গ্রন্থ 'আল-তা'জীম ওয়াল মেন্না'তে لتؤمنن به ولتنصرنه এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ এ আয়াতে রসূল বলে মুহাম্মদ (সা)-কে বোঝানো হয়েছে এবং এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হন নি, যাঁর কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে অঙ্গীকার নেওয়া হয় নি। এমনিভাবে এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হন্ নি, যিনি স্বীয় উম্মতকে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ও সাহায্য সমর্থন করতে নির্দেশ দেন নি। যদি মহানবী (সা) সে সব পয়গম্বরের আমলেই আবির্ভূত হতেন, তবে তিনিই সবার নবী হতেন এবং তাঁরা সবাই তাঁর উম্মত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি শুধু উম্মতেরই নবী নন, নবীগণেরও নবী। এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ "আজ যদি মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যন্তর ছিল না।"

অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ যখন ঈসা (আ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন তিনিও কোরআন এবং তোমাদের নবীর বিধি-বিধান পালন করবেন।

—(তফসীরে ইবনে-কাসীর)

এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সা)-র নবুয়ত বিশ্বজনীন। তাঁর শরীয়তের মধ্যে পূর্ববর্তী সব শরীয়ত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এ বর্ণনা থেকে بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً (আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।) হাদীসের বিশুদ্ধ অর্থও ফুটে উঠেছে। মহানবী (সা)-র নবুয়ত তাঁর আমল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য—হাদীসের এরূপ অর্থ করা ঠিক নয়। বরং তাঁর নবুয়তের যমানা এত বিস্তৃত যে, হযরত আদম (আ)-এর নবুয়তেরও আগে থেকে এর আরম্ভ। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ

كنت نبيا وادم بين الروح والجسد —(আদমের দেহে আত্মা সঞ্চারের পূর্বেই আমি নবী ছিলাম)। হাশরের ময়দানে শাফা'আতের জন্য অগ্রসর

হওয়া, তাঁর পতাকাতলে সমগ্র মানবজাতির একত্রিত হওয়া এবং মি'রাজ-রজনীতে বায়তুল-মুকাদ্দাসে সব পয়গম্বরের ইমামতি করা তাঁর বিশ্বজনীন নেতৃত্বের অন্যতম লক্ষণ।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

(৮৫) যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে, তা (সে ধর্ম) কখনও (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে) গৃহীত হবে না এবং সে (ব্যক্তি) পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে (অর্থাৎ মুক্তি পাবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামই মুক্তির পথ ঃ 'ইসলাম' শব্দের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য করা। পরিভাষায় একটি বিশেষ ধর্মের আনুগত্য করার নাম ইসলাম, যা আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। কেননা, সব পয়গম্বরের শরীয়তে ধর্মের মূলনীতি এক ও অভিন্ন।

অতঃপর 'ইসলাম' শব্দটি কখনও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও শুধু সর্বশেষ শরীয়তের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা শেষ নবী (সা)-র প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনে উভয় প্রকার ব্যবহারই বিদ্যমান। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ নিজেকে 'মুসলিম' এবং নিজ নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ্' বলেছেন—একথাও কোরআন থেকে প্রমাণিত রয়েছে। শেষ নবী (সা)-র উম্মতকে বিশেষভাবে মুসলিম বলেও কোরআনে উল্লিখিত রয়েছে। هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا

মোট কথা, যে কোন পয়গম্বর যে কোন খোদায়ী ধর্ম নিয়ে জগতে আগমন করেছেন, তাকেই 'ইসলাম' বলা হয় এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের বিশেষ উপাধি হিসাবেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্য আয়াতে 'ইসলাম' শব্দ দ্বারা কোন্ অর্থটি বোঝানো হয়েছে।

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যে কোন অর্থই বোঝানো হোক, পরিণামের দিক দিয়ে তাতে কোন পার্থক্য হয় না, কেননা, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের 'ইসলাম' একটি সীমিত

শ্রেণীর জন্য এবং বিশেষ যমানার জন্য ছিল। ঐ শ্রেণীর উম্মত ছাড়া অন্যদের জন্য তখনও সেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই নবীর পর যখন অন্য নবী প্রেরিত হন, তখন সেই ইসলামও বিদায় নেয়। নতুন নবী যা নিয়ে আগমন করতেন, তাই হতো তখনকার ইসলাম। এতে অবশ্য মৌলিক কোন পরিবর্তন হতো না, শুধু শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্ন হতো। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-কে যে ইসলাম দেওয়া হয়েছে, তা অপরিবর্তনীয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী তাঁর আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এখন পূর্বেকার ইসলাম আর ইসলাম নয়। বরং হুযুর (সা)-এর মাধ্যমে যা পৃথিবীতে পৌঁছেছে, তাই হলো ইসলাম। এ কারণেই বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ আজ যদি হযরত মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আ) যখন অবতরণ করবেন, তখন নবুয়তের পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার শরীয়তেরই অনুসরণ করবেন।

অতএব, এ আয়াতে ইসলামের যে কোন অর্থ ই নেওয়া হোক, পরিণাম উভয়েরই এক। অর্থাৎ শেষ নবীর আবির্ভাবের পর একমাত্র তাঁর আনীত ধর্মকেই ইসলাম বলা হবে। এ ধর্মই বিশ্বাসীর মুক্তির উপায়। আলোচ্য আয়াতে এ ধর্ম সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ্র কাছে তা গ্রহণীয় নয়।

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ
حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اُولٰۗىِٕكَ
جَزَاۗؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰۗىِٕكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۣ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ اِلَّا
الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۣ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ
وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الضَّاۗلُّوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ
فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ۭ
اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

(৮৬) কেমন করে আল্লাহ্ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফির হয়েছে। আর আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। (৮৭) এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত (৮৮) সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব হালকাও হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না। (৮৯) কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করে নেবে এবং সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৯০) যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কস্মিনকালও তাদের তওবা কবুল করা হবে না—আর তারা হলো গোমরাহ্। (৯১) যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেওয়া হয় তবুও যারা কাফির হয়েছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব! পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথমে এসব ধর্মত্যাগীদের কথা বর্ণান করা হচ্ছে, যারা কুফরীতে কায়েম থেকে কুফরকে হেদায়েত মনে করছিল। তাদের বিশ্বাস অথবা দাবী ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখন তাদের হেদায়েত করেছেন। এ কারণে তাদের নিন্দায় এ বিষয়টি খণ্ডন করে বলেন) ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ সম্প্রদায়কে কিরূপে হেদায়েত দান করবেন, যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর কাফির হয়ে গেছে ? তারা (মুখে) সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, রসূল ([সা] রিসালতের দাবীতে সত্যবাদী) এবং তাদের কাছে (ইসলামের সত্যতার) প্রকাশ্য প্রমাণাদি এসেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এমন জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (এর অর্থ এই নয় যে, এমন লোকদের কখনও ইসলামের তওফীক দেন না; বরং তাদের উল্লিখিত দাবী নাকচ করাই এখানে মূল উদ্দেশ্য। তারা বলতো, আল্লাহ্ আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। তাই আমরা ইসলাম ত্যাগ করে এ পথ অবলম্বন করেছি। মোট কথা, যারা কুফরের গোমরাহ পথ অবলম্বন করে, তারা আল্লাহ্র হেদায়েতের অনুসারী নয়। কাজেই তারা একথা বলতে পারে না যে, আল্লাহ্ হেদায়েত দিয়েছেন। কারণ এটা হেদায়েতের পথ নয়; বরং তারা নিশ্চিতই পথভ্রষ্ট)। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের ওপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানবজাতির অভিসম্পাত। তারা চিরকাল এতে (অর্থাৎ অভিসম্পাতে) থাকবে। (এ অভিসম্পাতের পরিণামফল হলো জাহান্নাম। কাজেই অর্থ এই যে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। তাদের শাস্তি প্রশমিত করা হবে না এবং তাতে বিরাম দেওয়া হবে না। অতঃপর তাদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা পুনর্বার মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।) কিন্তু অতঃপর (অর্থাৎ কুফরের পরে) যারা তওবা করেছে (অর্থাৎ মুসলমান হয়ে গেছে) এবং সংশোধিত হয়েছে (অর্থাৎ মুনাফিকের মত শুধু মুখে তওবা করাই যথেষ্ট নয়,) নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল ও করুণাময়। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপনের

পর অবিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর অবিশ্বাসে বর্ধিত হয়েছে (অর্থাৎ অবিশ্বাসেই রয়ে গেছে —বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তাদের তওবা (তা অন্য গোনাহ্র জন্য করলেও) কখনও গৃহীত হবে না (কারণ, তওবা গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান)। তারাই (এ তওবার পরেও যথারীতি) পথভ্রষ্ট। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণও করেছে, তাদের কারও কাছ থেকে (কাফ্ফারা হিসাবে) পৃথিবী-ভর্তি স্বর্ণও নেওয়া হবে না—যদিও সে মুক্তির বিনিময়ে তা দিতেও চায় (আর দিতে না চাইলেই বা কে জিজ্ঞেস করে)। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

একটি সন্দেহের অপনোদনঃ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ - এ আয়াত থেকে বাহ্যত সন্দেহ হয় যে, ধর্মত্যাগী হওয়ার পর কেউ হেদায়েত পায় না। অথচ বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। কেননা, অনেক লোক ধর্মত্যাগী হওয়ার পরও ঈমান এনে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

উত্তর এই যে, আয়াতে হেদায়েতের সম্ভাবনা নাকচ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের বাচনভঙ্গিতে এর উদাহরণ, যেন কোন বিচারক নিজ হাতে কোন দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিলেন। দুষ্কৃতকারী বলতে লাগলোঃ বিচারক নিজ হাতে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। এর উত্তরে বিচারক বললেনঃ এমন দুরাচারকে আমি কেন মর্যাদা দান করতে যাবো? অর্থাৎ এটা মর্যাদাদানের ব্যাপারই নয়। অর্থ এই নয় যে, এ ব্যক্তি শিষ্টতা অবলম্বন করার পরেও মর্যাদাপ্রাপ্তির যোগ্য হতে পারে না।

(বয়ানুল-কোরআন)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۵

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۹۲﴾

---

(৯২) কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্ তা জানেন।

ব্যাখ্যাসহ পূর্বাপর যোগসূত্রঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, কাফির ও মুশরিকদের সদকা ও খয়রাত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়। আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জন্যে গ্রহণীয় সদকা ও তার রীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রথমে بِرٌّ শব্দের অর্থ ও স্বরূপ জানা আবশ্যক।

بِرْ এর শাব্দিক অর্থ অন্যের হক পূর্ণরূপে আদায় করা। অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহারের অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। بار এবং بر সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজ দায়িত্বে আরোপিত যাবতীয় হক পুরাপুরি আদায় করে। কোরআনে بَرًّا بِوَالِدَتِىْ এবং بَرًّا بِوَالِدَيْهِ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি, যে পিতামাতার হক পুরাপুরি আদায় করে।

بَرٌّ শব্দের বহুবচন اَبْرَارٌ কোরআনে এর ব্যবহার বিস্তর। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ আরও এক আয়াতে আছে ঃ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ

এই শেষ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, بر এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে فجور।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ 'সিদক' তথা সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে থাক। কেননা, সিদক بر এর সঙ্গী। এরা উভয়েই জান্নাতে থাকবে এবং মিথ্যাবাদিতা থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা, মিথ্যাবাদিতা فجور তথা পাপাচারের সঙ্গী। এরা উভয়েই জাহান্নামে থাকবে। (আদাবুল-মুফরাদ, ইবনে মাজাহ্, মসনদে আহমদ)

সূরা বাক্বারার এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ-

এ আয়াতে সৎকর্মের একটি তালিকা দিয়ে সবগুলোকে بر আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, সৎকর্মসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা। বলা হয়েছে, সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করা

পর্যন্ত তোমরা بر অর্জন করতে পারবে না। অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার হক পুরাপুরি আদায় হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু থেকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর। পরন্তু ابرار-এর কাতারভুক্ত হওয়াও এরই উপর নির্ভরশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুসলমানগণ !) তোমরা পূর্ণ (অর্থাৎ বিরাট কল্যাণ) কখনও অর্জন করতে পারবে না, সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু থেকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত। তোমরা যাই ব্যয় কর (অপ্রিয় বস্তু হলেও) আল্লাহ্ তা'আলা তা পরিজ্ঞাত রয়েছেন। (তিনি এতেও সওয়াব দেবেন, কিন্তু পূর্ণ সওয়াব পেতে হলে তার পন্থা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত ও সাহাবায়ে কিরামের কর্ম-প্রেরণা ঃ সাহাবায়ে-কিরাম ছিলেন কোরআনী নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যক্ষ সঙ্গী। কোরআনী নির্দেশ পালনের জন্য তাঁরা ছিলেন চাতক-সম। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহায়-সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোন্‌টি তাঁদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর আল্লাহ্র পথে তা ব্যয় করার জন্য তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আবেদন করতে লাগলেন। মদীনার আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবূ তাল্‌হা (রা)। মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাঁর একটি বাগানে 'বীরহা' নামে একটি কূপ ছিল। বর্তমানে বাগানের স্থলে বাবে-মজীদীর সামনে 'আস্তফা-মনযিল' নামে একটি দালান অবস্থিত রয়েছে ! এতে মদীনা যিয়ারতকারী হাজীগণ অবস্থান করেন। এর উত্তর-পূর্ব কোণে 'বীরহা' কূপটি অদ্যাবধি স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন এবং বীরহা কূপের পানি পান করতেন। এ কূপের পানি তিনি পসন্দও করতেন। আবূ তালহা (রা)-র এ বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর এবং তাঁর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বীরহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি একে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে কাজে পসন্দ করেন, একে খরচ করুন। হুযুর (সা) বললেন ঃ বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে আপনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দিন। হযরত আবূ তালহা (রা) এ পরামর্শ শিরোধার্য করে বাগানটি স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। ---(বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, শুধু ফকীর-মিসকীনকে দিলেই পুণ্য হয় না--- স্বীয় পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য ও সওয়াবের কাজ।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) তাঁর আরোহণের প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে উপস্থিত হন এবং আরয করেন ঃ আমার সম্পত্তির মধ্যে এটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একে

আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করতে চাই। মহানবী (সা) তাঁর ঘোড়াটি গ্রহণ করে তাঁরই পুত্র উসমানকে দান করলেন। দান করা বস্তু স্বগৃহে ফিরে যেতে দেখে যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু মহানবী (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ তোমার দান গৃহীত হয়েছে। ---(তফসীরে-মাযহারী, ইবনে জারীর, তাবারী)

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর কাছে একটি বাঁদী ছিল সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি তাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুক্ত করে দেন।

আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি মাস'আলা প্রণিধানযোগ্য।

সব ফরয ও নফল দান আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ঃ (এক)--কোন কোন আলিমের মতে আলোচ্য আয়াতে ফরয দান-খয়রাত, যথা যাকাতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আবার কারো মতে আয়াতে নফল দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞ আলিম সমাজের মতে আয়াতের অর্থে ফরয ও নফল উভয় প্রকার দান-খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (সাহাবায়ে-কিরামের উল্লিখিত ঘটনাবলী এ মতের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, তাঁদের দান-খয়রাত নফল শ্রেণীভুক্ত ছিল)।

কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র পথে, ফরয-নফল ইত্যাদি যে কোন দান-খয়রাত কর, তাতে পূর্ণ সওয়াব ও কল্যাণ পেতে হলে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু দান করতে হবে। দান-খয়রাতকে জরিমানা মনে করে গা এড়ানোর জন্য উদ্বৃত্ত অকেজো অথবা খারাপ বস্তু দান করা উচিত নয়। কোরআনের অপর একটি আয়াতে এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! নিজেদের উপার্জন থেকে এবং যা কিছু আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপন্ন করেছি, আল্লাহ্‌র পথে তা থেকে উত্তম বস্তু ব্যয় কর এবং ব্যয় করার জন্য এমন বাজে জিনিসের নিয়ত করবে না, যা প্রাপ্য হিসাবে তোমাদের দিলে তোমরাও কখনও গ্রহণ করবে না। তবে কোন কারণবশত চক্ষু বন্ধ করে গ্রহণ করলে তা ভিন্ন কথা।

সারকথা এই যে, বেছে বেছে খারাপ ও অকেজো বস্তু দান করলে তা গৃহীত হবে না। বরং প্রিয়বস্তু দান করলেই গৃহীত হবে এবং তার পুরোপুরি সওয়াব পাওয়া যাবে।

মধ্যপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ঃ (দুই)---আয়াতে مما শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা

হয়েছে যে, সমস্ত প্রিয় বস্তু নিঃশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য এই যে, যতটুকুই ব্যয় করবে, তার মধ্যে ভাল ও প্রিয় বস্তু দেখে ব্যয় করবে। তবেই পুরোপুরি সওয়াবের অধিকারী হতে পারবে।

(তিন)—প্রিয় বস্তু ব্যয় করার অর্থ শুধু অধিক মূল্যবান বস্তু ব্যয় করা নয়; বরং স্বল্প এবং মূল্যের দিক দিয়ে নগণ্য—এমন কোন বস্তুও কারও দৃষ্টিতে প্রিয় হলে, তা দান করলেও পুরোপুরি সওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি মনে যা দান করা হয়, তা একটি খেজুরের দানা হলেও তাতে দাতা আয়াতের বর্ণনা মতে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।

(চার)—আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, যারা গরীব নিঃসম্বল এবং দান করার মত অর্থ-কড়ির মালিক নয়, তারা আয়াতে বর্ণিত কল্যাণ ও বিরাট পুণ্য থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ, আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রিয় বস্তু ব্যয় করা ব্যতীত এ পুণ্য অর্জিত হবে না। গরীব-মিসকীনদের হাতে এমন কোন আকর্ষণীয় বস্তু নেই যে, তা ব্যয় করে তারা এ পুণ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়াতের অর্থ এরূপ নয় যে, প্রিয় অর্থ-কড়ি ব্যয় করা ব্যতীত এ লক্ষ্য অর্জিত হবে না; বরং এ পুণ্য ইবাদত, যিকর, তিলাওয়াত, অধিক নফল ইত্যাদি উপায়েও অর্জন করা যায়। কোন কোন হাদীসে এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রিয় বস্তুর অর্থ ঃ (পাঁচ)—প্রিয় বস্তু বলে কি বোঝানো হয়েছে? কোরআনের অন্য আয়াত থেকে জানা যায়, যে বস্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাজে লাগছে, যা ব্যতীত সে তার অভাব বোধ করে এবং যা উদ্বৃত্ত ও অকেজো নয়, তা-ই প্রিয় বস্তু। কোরআন বলে ঃ ....وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা খাদ্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও অভাবগ্রস্তদের খাদ্য দান করে। এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয় যদিও তারা স্বয়ং অভাবগ্রস্ত।

প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যয় করাও সওয়াবমুক্ত নয় ঃ (ছয়)—আয়াতে বলা হয়েছে, প্রিয় বস্তু দান করার উপর বিরাট পুণ্য অর্জন ও পুণ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া নির্ভরশীল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করলে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ---অর্থাৎ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পরিজ্ঞাত রয়েছেন। আয়াতের এ অংশের উদ্দেশ্য এই যে, কোন দান-খয়রাতই সাধারণ সওয়াব থেকে মুক্ত হবে না, প্রিয় বস্তুর দান-খয়রাত হোক কিংবা অতিরিক্ত বস্তুর। তবে যখনই ব্যয় করতে হয়, তখনই যেন বেছে বেছে অকেজো বস্তু ব্যয় করা হয়—এমন রীতি অবলম্বন করা মাক্‌রূহ্ ও নিষিদ্ধ। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রিয় বস্তুও ব্যয় করে এবং মাঝে মাঝে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু যেমন উদ্বৃত্ত খাদ্য, পুরাতন পোশাক, দোষযুক্ত পাত্র এবং ব্যবহারের বস্তুও দান করে দেয়, সে এতে গোনাহ্গার হবে না; বরং এ জন্যও সে সওয়াবের অধিকারী হবে।

আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয় যে, মানুষ যা ব্যয় করে, তার আসল স্বরূপ আল্লাহ্র অজানা নয়। প্রিয় কি অপ্রিয়, খাঁটি মনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছে, না লোক দেখানো ও সুখ্যাতির জন্য ব্যয় করছে ইত্যাদি সবই আল্লাহ্র জানা। আমি প্রিয় বস্তু আল্লাহ্র জন্য ব্যয় করছি ---মুখে এরূপ দাবি করলেই শুধু হবে না; বরং যে আল্লাহ্ অন্তরের গোপন ভেদ জানেন, তিনিই দেখছেন এ দান কোন্ পর্যায়ের দান।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَىٰةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا۟ بِالتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

(৯৩) তওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বনী ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল। তুমি বলে দাও, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর।' (৯৪) অতঃপর আল্লাহ্র প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তারাই জালিম—সীমা-লংঘনকারী। (৯৫) বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। এখন সবাই ইবরাহীমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্য ধর্মের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে (সব খাদ্যবস্তু নিয়ে আলোচনা, সে). সব খাদ্য বস্তু (হযরত ইবরাহীমের

আমল থেকে কখনও হারাম ছিল না, বরং এসব খাদ্যবস্তু) তওরাত অবতরণের পূর্বে (হযরত) ইয়াকুব (আ) (বিশেষ কারণে) নিজের জন্য যা হারাম করেছিলেন (অর্থাৎ উটের মাংস। এ মাংস তাঁর সন্তানের জন্যও হারাম ছিল)। তাছাড়া (অবশিষ্ট সব খাদ্যবস্তু বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। (এমতাবস্থায় হযরত ইবরাহীমের আমল থেকে এগুলো হারাম হওয়ার দাবী কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? 'তওরাত অবতরণের পূর্বে বলার কারণ এই যে, তওরাত অবতরণের পর উল্লিখিত হালাল বস্তুসমূহের মধ্য থেকেও অনেকগুলো হারাম হয়ে গিয়েছিল। এর বিবরণ সূরা আন্'আমের এ আয়াতে রয়েছে ঃ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ... ... এখনও যদি ইহুদীরা প্রাচীনকাল থেকে হারাম হওয়ার দাবী পরিত্যাগ না করে, তবে হে মুহাম্মদ! তাদের) বলে দিন ঃ তবে তওরাত উপস্থিত কর। অতঃপর তা পাঠ কর—যদি তোমরা (স্বীয় দাবীতে) সত্যবাদী হও। (তওরাত থেকে এ বিষয়ের কোন আয়াত বের করে দেখাও। কেননা, বর্ণিত বিষয় আয়াত ছাড়া প্রমাণিত হয় না। অন্য কোন আয়াত অবশ্যই নেই। কাজেই তওরাতের আয়াতই দেখাও। দেখাতে ব্যর্থ হলে তাদের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তাই বলেন ঃ) অতএব, যারা এর পরেও (অর্থাৎ মিথ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরেও) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে (যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীমের আমল থেকে উটের গোশত হারাম করেছেন), তারা বড়ই অত্যাচারী। আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলেছেন। সুতরাং (এখন) তোমরা (কোরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর) ইবরাহীমের ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামের) অনুসরণ কর—যাতে সামান্যতম বক্রতাও নেই। তিনি (ইবরাহীম) মুশরিক ছিলেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের সাথে বিতর্কের বিষয় বর্ণিত হয়েছে—কোথাও ইহুদীদের সাথে এবং কোথাও খৃস্টানদের সাথে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও একটি বিতর্কের বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে কলবী থেকে বর্ণিত ঘটনায় বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন যে, আমরা যাবতীয় মূলনীতিতে এবং অধিকাংশ শাখাগত বিধি-বিধানে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। এ কথা শুনে ইহুদীরা আপত্তি উত্থাপন করে বলল ঃ আপনারা উটের গোশত খান, দুধ পান করেন। অথচ এগুলো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি হারাম ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বললেন ঃ ভুল কথা, এগুলো তাঁর প্রতি হালাল ছিল। ইহুদীরা বলল ঃ আমরা যেসব বস্তু হারাম মনে করি, তা সবই হযরত নূহ (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমল থেকেই হারাম হিসাবে চলে এসেছে এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ কথোপকথনের পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ইহুদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ তওরাত অবতরণের পূর্বে উটের গোশত ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী ইসরাঈলের জন্যও হালাল ছিল। তবে উটের গোশত বিশেষ

কারণবশত হযরত ইয়াকুব (আ) নিজেই নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর বংশধরের জন্যও তা হারাম ছিল।

বিশেষ কারণটি ছিল এই যে, হযরত ইয়াকুব (আ) 'ইরকুন্নাসা' রোগে আক্রান্ত হয়ে মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ রোগ থেকে মুক্তি দিলে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবস্তু পরিত্যাগ করবেন। এরপর তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবস্তু উটের গোশত পরিত্যাগ করেন। (হাকেম, তিরমিযী, রূহুল-মা'আনী) মানতের কারণে যে উটের গোশত হারাম হয়েছিল, তা ওহীর নির্দেশে বনী-ইসরাঈলের জন্য পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল। এতে বোঝা গেল যে, তাদের শরীয়তে মানতের কারণে হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যেতো। আমাদের শরীয়তেও মানতের কারণে জায়েয কাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু মানত করে হালালকে হারাম করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মানত কসমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ

—(তফসীরে কবীর)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝٩٦

(৯৬) নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় (ইবাদতালয়সমূহের মধ্যে) যে গৃহ সর্বপ্রথম মানবজাতির (ইবাদতের) জন্য (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) নির্দিষ্ট করা হয়, তা ঐ গৃহ, যা বাক্কা শহরে অবস্থিত (অর্থাৎ মক্কার কা'বাগৃহ)। তার অবস্থা এই যে, তা বরকতময় (কেননা, তাতে ধর্মীয় কল্যাণ অর্থাৎ সওয়াব রয়েছে)। এবং (বিশেষ ইবাদত, যথা নামাযের দিকনির্দেশে) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক। (উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় এবং হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে নামাযের সওয়াব অনেক বেশী হয়। এগুলো ধর্মীয় কল্যাণ। আর যারা সেখানে উপস্থিত নয়, এ গৃহের মাধ্যমে তারা নামাযের দিক জানতে পারে, এটাও পথপ্রদর্শন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে সারা বিশ্বের গৃহ, এমন কি, মসজিদ ও ইবাদতালয়সমূহের মুকাবিলায় কা'বাগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ একাধিক ঃ

কা'বাগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্মাণ ইতিহাস ঃ প্রথমত, এটি সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম ইবাদতালয়।

দ্বিতীয়ত, এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার।

তৃতীয়ত, এ গৃহ সারা বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়, তা ঐ গৃহ, যা বাক্কায় (মক্কার অপর নাম ছিল বাক্কা) অবস্থিত। অতএব, কা'বাগৃহই বিশ্বের সর্বপ্রথম ইবাদতালয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ ইবাদতের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে কোন ইবাদতগৃহও ছিল না এবং বাসগৃহও ছিল না। হযরত আদম (আ) ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী। তাঁর পক্ষে এমনটি অকল্পনীয় নয় যে, পৃথিবীতে আগমনের পর তিনি নিজের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের আগেই আল্লাহ্‌র ঘর অর্থাৎ ইবাদতের গৃহ নির্মাণ করেন। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভব যে, মানুষের বসবাসের গৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু ইবাদতের জন্য কা'বাগৃহই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল। এ মতটি হযরত আলী (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীস রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ্‌ তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁদের কা'বাগৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। এ গৃহ নির্মিত হয়ে গেলে তাঁদের তা প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করার আদেশ দেওয়া হয় এবং বলা হয়, আপনি সর্বপ্রথম মানব এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ —যা মানবমণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। —(ইবনে কাসীর)

কোন কোন হাদীসে আছে, হযরত আদম (আ) কর্তৃক নির্মিত এ কা'বাগৃহ নূহের মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং এর চিহ্ন পর্যন্তও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) প্রাচীন ভিত্তির ওপর এ গৃহ পুনর্নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনর্নির্মাণ করেন। এভাবে কয়েকবার বিধ্বস্ত হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কুরায়শরা এ গৃহ নির্মাণ করেন। এতে মহানবী (সা)-ও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজরে-আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরায়শদের এ নির্মাণের ফলে ইবরাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমত, কা'বার একটি অংশ 'হাতীম' কা'বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।—দ্বিতীয়ত, ইবরাহীম (আ)-এর নির্মাণে কা'বা গৃহের দরজা ছিল দুইটি—একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কুরায়শরা শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা রাখে। তৃতীয়ত, তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে—যাতে সবাই সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। বরং তারা যাকে অনুমতি দেয় সেই যেন প্রবেশ করতে পারে। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) একবার হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন ঃ আমার ইচ্ছা

হয়, কা'বাগৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙে দিয়ে ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বাগৃহ ভেঙে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞ লোকদের মনে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেওয়ার আশংকার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। এ কথাবার্তার কিছুদিন পরেই মহানবী (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

কিন্তু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নেয় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) মহানবী (সা)-র উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করেন এবং কা'বাগৃহের নির্মাণ ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব বেশীদিন টেকেনি। অত্যাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মক্কায় সৈন্যাভিযান করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই সে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা)-এর এ চিরস্মরণীয় কীর্তিটি মুছে ফেলতে মনস্থ করে। সেমতে সে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা)-এর এ কাজ ঠিক হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বাগৃহকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। এ অজুহাতে কা'বাগৃহকে আবার ভেঙে জাহিলিয়াত আমলের কুরায়শরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করা হলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোন বাদশাহ উল্লিখিত হাদীসদৃষ্টে কা'বাগৃহকে ভেঙে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইমাম হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা) ফতোয়া দেন যে, এভাবে কা'বাগৃহের ভাঙাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহ্দের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বাগৃহ তাদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সেই অবস্থায়ই থাকতে দেওয়া উচিত। বিশ্বের মুসলিম সমাজ তাঁর এ ফতোয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাট ভাঙাগড়ার কাজ সব সময়ই অব্যাহত থাকে।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, খানায়ে-কা'বা জগতের সর্বপ্রথম গৃহ এবং কমপক্ষে সর্বপ্রথম ইবাদতালয়। কোরআনে যেখানে আল্লাহ্র আদেশে হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কর্তৃক কা'বাগৃহ নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁরা কা'বাগৃহের প্রাথমিক ভিত নির্মাণ করেন নি, বরং সাবেক ভিত্তির ওপরই নির্মাণ করেন। আয়াত وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيلُ থেকেও বোঝা যায় যে, কা'বাগৃহের ভিত্তি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সূরা হজ্জের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ অর্থাৎ যখন আমি ইবরাহীমের জন্য এ গৃহের স্থান ঠিক করে দিলাম। এতেও বোঝা যায় যে, কা'বাগৃহের স্থান পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল।

কোন কোন রেওয়ায়তে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কা'বাগৃহ নির্মাণের আদেশ দেওয়া হলে ফেরেশতার মাধ্যমে বালুকার টিলার নিচে লুক্কায়িত সাবেক ভিত্তি চিহ্নিত করে দেওয়া হয়।

মোট কথা, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কা'বাগৃহের একটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো যে, এ হচ্ছে জগতের সর্বপ্রথম গৃহ অথবা সর্বপ্রথম ইবাদতালয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, হযরত আবূ যর (রা) হুযুর (সা)-কে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্‌টি? উত্তর হলো ঃ মসজিদে-হারাম। আবার প্রশ্ন করা হলো ঃ এরপর কোন্‌টি? উত্তর হলো ঃ মসজিদে বায়তুল-মুকাদ্দাস। আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দুটি মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? উত্তর হলো ঃ চল্লিশ বছর।

এ হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হাতে কা'বা গৃহের পুনর্নির্মাণের দিক দিয়ে বায়তুল-মুকাদ্দাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, বায়তুল-মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাণও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হাতে কা'বা গৃহ নির্মাণের চল্লিশ বছর পর সম্পন্ন হয়। এরপর হযরত সুলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণ করেন। এভাবে বিভিন্ন হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা দূর হয়ে যায়।

আদিকাল থেকেই কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। আয়াতে وضع للناس শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্ম্য নিহিত রেখেছেন যে, মানুষের অন্তর আপনা-আপনিই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। আয়াতে উল্লিখিত 'বাক্কা' শব্দের অর্থ মক্কা। এখানে 'মীম' অক্ষরকে 'বা' অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথবা উচ্চারণ ভেদে অপর নাম 'বাক্কা'।

কা'বাগৃহের বরকত ঃ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে কা'বাগৃহকে 'মুবারক' (বরকতময়) বলা হয়েছে। 'মুবারক' শব্দটি বরকত থেকে উদ্ভূত। 'বরকত' শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। কোন বস্তু দুইভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এক, প্রকাশ্যত বস্তুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। দুই, তদ্দ্বারা এত বেশী কাজ হওয়া, যা তদপেক্ষা বেশী বস্তু দ্বারা সাধারণত সম্ভব হয় না। একেও অর্থগত দিক দিয়ে 'বৃদ্ধি পাওয়া' বলা যেতে পারে।

কা'বাগৃহের বরকতময় হওয়া বাহ্যিক এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়েই রয়েছে। বাহ্যিক বরকত এই যে, মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা শুষ্ক বালুকাময় অনুর্বর মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও এতে সব সময়, সব ঋতুতে সব রকম ফলমূল, তরি-তরকারি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এত বিপুল পরিমাণে মজুত থাকে, যা শুধু মক্কাবাসীদের জন্যই নয়—বহিরাগতদের জন্যও যথেষ্ট। বহিরাগতদের অবস্থা সবাই জানে। বিশেষত হজ্জের মওসুমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে সমবেত হয়। তাদের সংখ্যা মক্কার অধিবাসীদের চার-পাঁচ গুণ বেশী হয়ে থাকে। এ বিরাট জনসমাবেশ সেখানে দু-চার দিন নয়—কয়েক মাস অবস্থান করে। হজ্জের মওসুম ছাড়াও এমন কোন দিন যায় না, যখন সেখানে হাজার হাজার বহিরাগত মানুষের ভিড় না থাকে।

বিশেষত হজ্জের মওসুমে যখন সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়, তখনও এমন কথা শোনা যায়নি যে, বাজারে জরুরী পণ্যসামগ্রীর অভাব দেখা দিয়েছে। মক্কায় পৌঁছে কোন কোন হাজী শত শত ভেড়া-দুম্বাও কুরবানী করেন। গড়ে জনপ্রতি একটি কুরবানী তো অবশ্যই হয়। এ লক্ষ লক্ষ ভেড়া-দুম্বা সেখানে সব সময়ই পাওয়া যায়। এগুলো বাইরে থেকে আমদানী করার ব্যবস্থা করতে হয় না।

এ হচ্ছে বাহ্যিক বরকতের অবস্থা—যা উদ্দিষ্ট নয়। অর্থগত ও আধ্যাত্মিক বরকত যে কি পরিমাণ, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কতিপয় প্রধান ইবাদত বিশেষ করে কা'বাগৃহেই করা যায়। এসব ইবাদতে যে বিরাট সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে, তা কা'বাগৃহের কারণেই হয়ে থাকে। উদাহরণত হজ্জ ও ওমরাহ্। আরও কিছু ইবাদত আছে, যা মসজিদে-হারামে করলে সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, বাসগৃহে নামায পড়লে এক নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু মহল্লার মসজিদে পড়লে পঁচিশ নামাযের, জামে মসজিদে পড়লে পাঁচশ নামাযের, মসজিদে-আকসায় পড়লে এক হাজার নামাযের, আমার মসজিদে পড়লে পঞ্চাশ হাজার নামাযের এবং মসজিদে-হারামে পড়লে এক লক্ষ নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। ---(ইবনে মাজাহ্, তাহাভী)

হজ্জের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধভাবে হজ্জব্রত পালনকারী মুসলমান বিগত গুনাহ্ থেকে এমনভাবে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়, যেন সদ্য মায়ের গর্ভ থেকে নিষ্পাপ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এগুলো কা'বাগৃহেরই অর্থগত ও আধ্যাত্মিক বরকত। আয়াতের শেষাংশে هُدًى বলে এসব বরকতই ব্যক্ত করা হয়েছে।

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

(৯৭) এতে রয়েছে 'মকামে-ইবরাহীমের' মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রাপ্য ; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না—আল্লাহ্ সারা বিশ্বের মানুষের কোনই পরোয়া করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতে (শ্রেষ্ঠত্বের কিছু আইনগত ও কিছু সৃষ্টিগত) প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ (মজুদ) রয়েছে। (আইনগত নিদর্শনসমূহের মধ্যে বরকতময় ও পথপ্রদর্শক হওয়ার বিষয় তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু মাকামে-ইবরাহীমের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ—

এতে প্রবেশকারীর পক্ষে নিরাপদ হওয়া এবং শর্তসহ এর হজ্জ ফরয হওয়া। এ চারটি নিদর্শন এখানে আইনগত। এখন মাঝখানে সৃষ্টিগত নিদর্শন উল্লেখ করা হচ্ছে। এই নিদর্শনসমূহের) একটি হচ্ছে মাকামে-ইবরাহীম। (আরেকটি আইনগত নিদর্শন এই যে,) যে ব্যক্তি এর (নির্ধারিত সীমার) মধ্যে প্রবেশ করে, সে (আইনত) নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। (আরেকটি আইনগত নিদর্শন এই যে,) আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য মানুষের ওপর এ গৃহের হজ্জ করা ফরয। (তবে সবার ওপর নয়, বরং ঐ ব্যক্তির ওপর) যে এ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য সামর্থ্যবান। আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র নির্দেশ) অস্বীকার করে, (তাতে আল্লাহ্‌র কি ক্ষতি? কেননা) আল্লাহ্ বিশ্বজগত থেকে বে-পরওয়া (কারও অস্বীকারে তাঁর কিছুই আসে যায় না ; বরং স্বয়ং অস্বীকারকারীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কা'বাগৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য ঃ আলোচ্য আয়াতে কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, এতে আল্লাহ্‌র কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মকামে-ইবরাহীম। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায় ; কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না। তৃতীয়ত, সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এতে হজ্জব্রত পালন করা ফরয যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে।

কা'বাগৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ্ তা'আলা এর বরকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন। বাদশাহ্ আবরাহা বিরাট হস্তীবাহিনী-সহ কা'বাগৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতে পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কার হেরেমে প্রবেশকারী মানুষ এমনকি, জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়াররাও এ বিষয়ে সচেতন। এ সীমানায় প্রবেশ করে তারাও নিজেদের নিরাপদ মনে করে। সেখানে বন্য ও হিংস্র জন্তু মানুষ দেখে পালায় না। সাধারণভাবে দেখা যায়, কা'বাগৃহের যে পার্শ্বে বৃষ্টি হয়, সে পার্শ্বস্থিত দেশগুলোতে প্রচুর বারিপাত হয়। আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন এই যে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী সেখানে একত্রিত হয়। তারা জামরাত নামক স্থানে প্রত্যেকেই প্রতিটি নিদর্শন লক্ষ্য করে দৈনিক সাতটি করে কঙ্কর তিন দিন পর্যন্ত নিক্ষেপ করে। যদি এসব কংকর সেখানেই জমা থাকতো, তবে এক বছরেই কংকরের স্তূপের নিচে জামরাত অদৃশ্য হয়ে যেতো এবং কয়েক বছরে সেখানে কঙ্করের বিরাট পাহাড় গড়ে উঠতো। অথচ হজ্জের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেখানে কঙ্করের খুব একটা স্তূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কংকর দেখা যায় মাত্র। এর কারণ প্রসঙ্গে হুযুর (সা) বলেন ঃ ফেরেশতারা এসব কঙ্কর তুলে নেয়। যাদের হজ্জ কোন কারণে কবুল হয় না, শুধু তাদের কঙ্করই এখানে থেকে যায়। এ কারণেই জামরাত থেকে কংকর তুলে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো কবুল করা হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ উক্তির সত্যতা প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখেন। জামরাতের আশেপাশে সামান্য কঙ্করই দৃষ্টিগোচর

হয়। অথচ সেগুলো সেখান থেকে সরানোর বা পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকেও নেই; জনগণের পক্ষ থেকেও নেই।

এ কারণেই শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) খাসায়েসে-কুবরা নামক গ্রন্থে বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতক মু'জিযা তাঁর ওফাতের পরও দেদীপ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, প্রত্যেকেই তা অবলোকন করতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআনের। সমগ্র বিশ্ব এ অনন্য কিতাবটির সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে অক্ষম। এ অক্ষমতা যেমন তাঁর জীবদ্দশায় ছিল, তেমনি আজও রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। প্রতি যুগের মুসলমান বিশ্বকে একথা বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে, فأتوا بسورة من مثله কোরআনের সূরার মত একটি সূরা তৈরী কর দেখি! এমনিভাবে জামরাত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ এসব জামরাতে নিক্ষিপ্ত কংকর অদৃশ্যভাবে ফেরেশতারা তুলে নেয়। যাদের হজ্জ কবুল হয় না, শুধু সেসব হতভাগ্যদের কংকরই থেকে যায়। তাঁর এ উক্তির সত্যতা প্রতি যুগেই প্রমাণিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবে। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর অক্ষয় মু'জিযা এবং কা'বা গৃহ সম্পর্কিত একটি বিরাট নিদর্শন।

মকামে ইবরাহীমঃ মকামে ইবরাহীম কা'বাগৃহের একটি বড় নিদর্শন। এ কারণেই কোরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মকামে ইবরাহীম একটি পাথরের নাম। এর ওপর দাঁড়িয়েই হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বাগৃহ নির্মাণ করতেন। একে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছেঃ নির্মাণের উচ্চতার সাথে সাথে প্রস্তরটিও আপনা-আপনি উঁচু হয়ে যেতো এবং নিচে অবতরণের সময় নিচু হয়ে যেতো। এ প্রস্তরের গায়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। একটি অচেতন ও জড় প্রস্তরের প্রয়োজনানুসারে উঁচু ও নিচু হওয়া এবং মোমের মত নরম হয়ে নিজের মধ্যে পদচিহ্ন গ্রহণ করা---এসবই আল্লাহ্র অপার কুদরতের নিদর্শন এবং এতে কা'বা-গৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ প্রস্তরটি কা'বাগৃহের নিচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন কোরআনে মকামে-ইবরাহীমে নামায পড়ার আদেশ অবতীর্ণ হয় (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে প্রস্তরটি সেখান থেকে অপসারিত করে কা'বাগৃহের সামান্য দূরে যমযম কূপের নিকট স্থাপন করা হয়। একে এ স্থানেই একটি নিরাপদ কক্ষে তালাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। কা'বা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকআত নামায এর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়া হয়। অধুনা কক্ষটি সরিয়ে নিয়ে মকামে-ইবরাহীমকে একটি কাচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। আসলে এ বিশেষ প্রস্তরটিকেই মকামে-ইবরাহীম বলা হয়। তওয়াফ পরবর্তী নামায এর উপরে অথবা আশেপাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মকামে-ইবরাহীম সমগ্র মসজিদে-হারামকেও বোঝায়। এ কারণেই ফিকহ্বিদগণ বলেনঃ মসজিদে-হারামের যে কোন স্থানে তওয়াফ-পরবর্তী নামায পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

কা'বাগৃহে প্রবেশকারীর নিরাপত্তাঃ কা'বাগৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে

বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ নিরাপত্তা একেত শরীয়তের আইন হিসাবে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, তাকে কষ্ট দেবে না বা হত্যা করবে না। যদি কেউ হত্যাকাণ্ড করে অথবা অন্য কোন অপরাধ করে এতে প্রবেশ করে, তবুও তাকে সেখানে শাস্তি দেবে না, বরং তাকে হেরেম থেকে বের হতে বাধ্য করবে। বের হওয়ার পর তাকে শাস্তি দেবে। এভাবে হেরেমে প্রবেশকারী ব্যক্তি শরীয়তের আইনানুযায়ী নিরাপদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, এ নিরাপত্তা সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। ফলে বিস্তর মতবিরোধ সত্ত্বেও তারা সবাই এ বিশ্বাসে এক মত যে, কা'বাগৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি যত বড় অপরাধী ও শত্রুই হোক না কেন, কা'বাগৃহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছুই বলা যাবে না; হেরেম শরীফকে সাধারণ কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। জাহিলিয়াত যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বাগৃহের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুন্ঠিত ছিল না। তাদের যুদ্ধপ্রিয়তা ও নিষ্ঠুরতা সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকে দেখেও মাথা হেঁট করে চলে যেতো; কিছুই বলতো না।

মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেরেমের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বাগৃহকে পবিত্র করা। বিজয়ের পর হযুর (সা) ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কা'বাগৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘন্টার জন্যই ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্য হেরেমে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন ঃ আমার পূর্বে কারো জন্য হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো জন্য হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রের বিরুদ্ধে মক্কায় সৈন্যাভিযান, হত্যা ও লুটতরাজ করেছিল। এতে কা'বাগৃহের সাধারণ নিরাপত্তা আইন এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে হাজ্জাজের এ কাজ হারাম ও মহাপাপ ছিল। সমগ্র মুসলিম জাতি এজন্য তাকে ধিক্কার দিয়েছে। এ ঘটনাকে কা'বাগৃহের সৃষ্টিগত সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থীও বলা যায় না। কারণ, হাজ্জাজ স্বয়ং এ কাজের বৈধতায় বিশ্বাসী ছিল না। সে-ও একে একটি জঘন্য অপরাধ মনে করতো। কিন্তু রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল।

মোট কথা একথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ মানবমণ্ডলী কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধকে অত্যন্ত জরুরী মনে করে। তারা হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবিকে জঘন্যতম পাপ বলে গণ্য করে। এটা সারা বিশ্বে একমাত্র কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্য।

কা'বাগৃহে হজ্জ ফরয হওয়া ঃ আয়াতে কা'বাগৃহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির প্রতি শর্তাধীনে কা'বাগৃহের হজ্জ

ফরয করেছেন। শর্ত এই যে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যদ্দ্বারা সে কা'বাগৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত-পা ও চক্ষু কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ, যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ীঘরে চলাফেরা করাই দুষ্কর। এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হবে?

মহিলাদের পক্ষে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরীয়তমতে নাজায়েয। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ হজ্জে থাকবে; নিজ খরচে করুক অথবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। এমনিভাবে কা'বাগৃহে পৌঁছার জন্য রাস্তা নিরাপদ হওয়াও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জানমালের ক্ষতির প্রবল আশংকা থাকে, তবে হজ্জের সামর্থ্য নাই বলে মনে করা হবে।

'হজ্জ' শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাত ও মুযদালিফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ্জ বলা হয়। এ ব্যাখ্যা কোরআন প্রদত্ত। হজ্জের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি রসূলুল্লাহ্ (সা) মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য আয়াতে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার পর বলা হয়েছে ঃ ومن كفر فان الله غنى عن العلمين—অর্থাৎ যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ব থেকে বে-পরওয়া।

সে ব্যক্তিই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যে পরিষ্কারভাবে হজ্জকে ফরয মনে করে না। সে যে ইসলামের গণ্ডী-বহির্ভূত, তা সবারই জানা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হজ্জকে ফরয বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, সে-ও এক দিক দিয়ে অবিশ্বাসী। আয়াতে শাসনের ভঙ্গিতে তার সম্পর্কে 'কুফর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, সে কাফিরদের মত কাজেই লিপ্ত। অবিশ্বাসী কাফির যেমন হজ্জের গুরুত্ব অনুভব করে না, সেও তদ্রূপ। এ কারণেই ফিকহ্-শাস্ত্রবিদগণ বলেন ঃ যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। কারণ সে কাফিরদেরই মত হয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ)।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى
مَا تَعْمَلُوْنَ ۝ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ

أُوتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ
وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيٰتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ
فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

(৯৮) বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব অমান্য করছ, অথচ তোমরা যা কিছু কর, তা আল্লাহ্‌র সামনেই রয়েছে। (৯৯) বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ঈমানদারদের বাধা দান কর—তোমরা তাদের দীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান কর, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন। (১০০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে-কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদের কাফিরে পরিণত করে দেবে। (১০১) আর তোমরা কেমন করে কাফির হতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ্‌র রসূল আর যারা আল্লাহ্‌র কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সরল পথের।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও তাদের সন্দেহ সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মাঝখানে কা'বাগৃহ ও হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পুনরায় আহ্‌লে-কিতাবদের সম্বোধন করা হচ্ছে। তবে এই সম্বোধনের বিষয়টি একটি বিশেষ ঘটনার সাথে জড়িত। ঘটনাটি এই যে, সাম্মাস ইবনে কায়স নামক জনৈক ইহুদী মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল। সে একবার এক মজলিসে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকজনকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে একত্রিত দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলো এবং তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টির ফন্দি আঁটলো। ইসলাম-পূর্বকালে এ দুই গোত্রের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ অব্যাহত ছিল। এ যুদ্ধ সম্পর্কে উভয় পক্ষের রচিত বীরত্বপূর্ণ গৌরবগাথা তখনো পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সাম্মাস জনৈক ব্যক্তিকে বললো ঃ তাদের মজলিসে পৌঁছে সে সব গৌরবগাথা আবৃত্তি কর। পরিকল্পনা মোতাবেক কবিতা পাঠ করার সাথে সাথে যেন আগুন জ্বলে উঠলো এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের আশংকা সৃষ্টি হয়ে গেল। দেখতে দেখতে যুদ্ধের দিন-তারিখও সাব্যস্ত হয়ে গেল। সংবাদ পেয়ে হুযুর আকরাম (সা) তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে বললেন ঃ একি মূর্খতা! আমার জীবদ্দশায় মুসলমান হয়ে পরস্পর বন্ধু-ভাবাপন্ন হওয়ার পর তোমরা এ কি করছ? তোমরা কি এ অবস্থায়ই কুফরের দিকে ফিরে যেতে চাও? এতে উভয় পক্ষের চৈতন্য ফিরে এলো। তারা বুঝতে পারলো যে, এটা ছিল শয়তানের প্ররোচনা। এরপর সবাই একে অপরকে বুকে জড়িয়ে

ধরে কান্নাকাটি করলো এবং তওবা করলো। এ ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ---(রূহুল মা'আনী)।

কয়েক আয়াত পর্যন্ত এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রথমে ঘটনার সাথে জড়িত আহ্‌লে-কিতাবদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এতে চমৎকার ভাষালঙ্কারের সাথে সংশ্লিষ্ট অপকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করার পূর্বে তাদের কুফরীর জন্যও ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায়, যে ক্ষেত্রে তাদের স্বয়ং মুসলমান হওয়া উচিত ছিল, তা না করে তারা অপরকে পথভ্রষ্ট করার ফিকিরে লেগে থাকে। অতঃপর মুসলমানদের প্রতি সম্বোধন ও আদেশ করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মুহাম্মদ ! আপনি (এসব আহ্‌লে-কিতাবকে) বলে দিন ঃ হে আহ্‌লে-কিতাবগণ, তোমরা (ইসলামের সত্যতা প্রকাশিত হওয়ার পর) কেন আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছ ? (মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সমস্ত নীতিমালাই এর অন্তর্ভুক্ত)। অথচ আল্লাহ্ তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে অবগত্। (তোমাদের কি ভয় হয় না ? হে মুহাম্মদ, তাদের আরও) বলে দিন যে, হে আহ্‌লে-কিতাবগণ, তোমরা কেন সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছ আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ সত্য ধর্ম) থেকে এমন ব্যক্তিকে, যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে ? তোমরা এ পথে বক্রতা সৃষ্টিতে তৎপর। (যেমন, উপরোক্ত ঘটনায় তারা মিল্লাতের সুদৃঢ় বাঁধনের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে ঐক্যের শক্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং এসব ঝামেলায় ফেলে তাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে প্রয়াসী ছিল)। অথচ তোমরা স্বয়ং অবগত (রয়েছ যে, এ কাজটি মন্দ)। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন। (যথাসময়ে এর সময়োচিত শাস্তি দেবেন)। হে মুসলমানগণ ! যাদের গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান), যদি তোমরা তাদের কোন এক দলের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদিগকে বিশ্বাস স্থাপন করার পর তোমাদের (বিশ্বাসগত অথবা কার্যগত) অবিশ্বাসীতে পরিণত করে দেবে। তোমরা অবিশ্বাস কিরূপে করতে পার (অর্থাৎ অবিশ্বাস করা তোমাদের জন্য বৈধ হতে পারে না)। অথচ (অবিশ্বাসবিরোধী কারণ সবই উপস্থিত রয়েছে। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী তোমাদের (কোরআনে) পাঠ করে শোনানো হয়। (এ ছাড়া) তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল বিদ্যমান রয়েছেন। (বিশ্বাসে কায়েম থাকার জন্য এ দুইটি শক্তিশালী উপকরণ রয়েছে। এ দুই উপায়ের শিক্ষা অনুযায়ী তোমাদের বিশ্বাসে কায়েম থাকা দরকার। মনে রেখো,) যে কেউ আল্লাহ্‌কে দৃঢ়রূপে ধারণ করে (অর্থাৎ বিশ্বাসে পুরোপুরি কায়েম থাকে) নিশ্চয়ই এরূপ ব্যক্তি সরল পথ প্রদর্শিত হয়। (অর্থাৎ সে সরল পথে থাকে। সরল পথে থাকাই যাবতীয় সাফল্যের মূল। সুতরাং এ আয়াতে এরূপ ব্যক্তিকে যাবতীয় সাফল্যের সুসংবাদ ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم
مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

(১০২) হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্‌কে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যিই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (১০৩) আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ্ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল যে, খৃস্টান, ইহুদী ও অন্যান্য লোক তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়। তোমরা সজ্ঞানে তাদের এ পথভ্রষ্টতা থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও। আলোচ্য দুটি আয়াতে মুসলমানদের দলগত শক্তিকে অজেয় করে তোলার দুটি প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথমত, আল্লাহ্-ভীতি (তাকওয়া), দ্বিতীয়ত, পরাস্পরিক ঐক্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে যথার্থভাবে ভয় কর। (যথার্থভাবে ভয় করার অর্থ এই যে, তোমরা শিরক ও কুফর থেকে যেমন আত্মরক্ষা করেছ, তেমনি গোনাহ্‌র কাজ থেকেও আত্মরক্ষা কর। শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত ঝগড়া-বিবাদ করা গোনাহ্‌র কাজ। এ থেকেও আত্মরক্ষা করা ফরয)। এবং (পূর্ণ) ইসলাম (এর অর্থও তাই, যা 'যথার্থ ভয় করা'র অর্থ ছিল) ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না (অর্থাৎ পূর্ণ আল্লাহ্-ভীতি ও পূর্ণ ইসলামের ওপর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কায়েম থেকো)। তোমরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ধর্মকে মৌলিক ও আনুষঙ্গিক নীতিমালা সহযোগে) আঁকড়ে থাক এবং পরস্পর অনৈক্য সৃষ্টি করো না (এ ধর্মেই এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে)। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র (যে) অনুগ্রহ (হয়েছে তা) স্মরণ কর---যখন তোমরা (পরস্পরে) শত্রু ছিলে, (অর্থাৎ ইসলাম-পূর্ব কালে, তখন আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ হচ্ছিল। সাধারণভাবে অধিকাংশ আরববাসীর

অবস্থাও তাই ছিল)। অতঃপর আল্লাহ্ (এখন) তোমাদের অন্তরে (একে অন্যের প্রতি) সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র (এ) অনুগ্রহে (এখন) পরস্পর ভাই ভাই (-এর মত) হয়ে গেছ। বস্তুত (এ অনুগ্রহের ওপরও একটি মূল অনুগ্রহের বর্ণনা করে বলেন ঃ) তোমরা (একেবারে) জাহান্নামের গর্তের কিনারায় (দণ্ডায়মান) ছিলে (অর্থাৎ কাফির হওয়ার কারণে জাহান্নামের এত নিকটে ছিলে যে, মৃত্যুই শুধুমাত্র ব্যবধান ছিল), অনন্তর আল্লাহ্ তা থেকে (অর্থাৎ সে গর্ত থেকে) তোমাদের রক্ষা করেছেন। (অর্থাৎ ইসলামের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অতএব, এখন তোমরা এসব অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের গোনাহ্ দ্বারা এসব অনুগ্রহকে নস্যাৎ করে দিও না। কেননা, পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে প্রথম অনুগ্রহ অর্থাৎ পারস্পরিক সম্প্রীতি আপনা-আপনি বিনষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অনুগ্রহ অর্থাৎ ইসলামও এতে ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়বে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব নির্দেশ যেমন খোলাখুলি বর্ণনা করেন,) তেমনি আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (অন্যান্য) নির্দেশ (ও) বর্ণনা করেন---যাতে তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদের জাতিগত শক্তির ভিত্তি ঃ আলোচ্য দুটি আয়াতের মধ্যে প্রথমটিতে প্রথম মূলনীতি এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথম মূলনীতিটি তাকওয়া বা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা অর্থাৎ তার অপছন্দনীয় কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকা।

'তাকওয়া' শব্দটি আরবী ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ 'ভয় করা'ও করা হয়। কারণ, যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, সেগুলো ভয় করারই বিষয়। কারণ তাতে খোদায়ী শাস্তির ভয় থাকে। এ তাকওয়া তথা বেঁচে থাকার কয়েকটি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই 'মুত্তাকী' (আল্লাহ্ ভীরু) বলা যায় ---যদিও সে গোনাহে লিপ্ত থাকে। এ অর্থ বোঝানোর জন্যও কোরআনে অনেক জায়গায় 'মুত্তাকীন' ও 'তাকওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর---যা আসলে কাম্য---তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের পসন্দনীয় নয়। কোরআন ও হাদীসে তাকওয়ার যে সব ফযীলত ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ স্তরের 'তাকওয়ার' ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। আম্বিয়া আলায়হিসসালাম ও তাঁদের বিশেষ উত্তরাধিকারী ওলীগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। আলোচ্য আয়াতে اتقوا الله বলার পর حق تقاته বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক।

তাকওয়ার হক কি ঃ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ ও হাসান বসরী (র) বলেন ঃ (রসূলুল্লাহ্ [সা] থেকেও এমনি বর্ণিত হয়েছে) ঃ

حق تقاته هو ان يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر-(بحر محيط)

---তাকওয়ার হক এই যে, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহ্কে সর্বদা স্মরণে রাখা---কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা---অকৃতজ্ঞ না হওয়া। ---(বাহ্রে মুহীত)

তফসীরবিদগণ এ উদ্দেশ্যকেই বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণত কেউ বলেছেন ঃ তাকওয়ার হক হলো আল্লাহ্র কাজে কারো ভৎর্সনা বা তিরস্কারের তোয়াক্কা না করা এবং সর্বদা ন্যায়নীতিতে অটল থাকা, যদিও ন্যায়াবলম্বন করতে গেলে নিজের অথবা সন্তান-সন্ততির অথবা পিতামাতার ক্ষতি হয়। কেউ কেউ বলেছেন ঃ রসনা সংযত না করা পর্যন্ত কেউ তাকওয়ার হক আদায় করতে পারে না।

কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে আছে---اِتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ

---সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর। হযরত ইবনে আব্বাস ও তাউস (রা) বলেন ঃ এ আয়াতটি বাস্তবে তাকওয়ার হকেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাক। এভাবেই তাকওয়ার হক আদায় হবে। অতএব, কোন ব্যক্তি অবৈধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য পূর্ণশক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে তা তাকওয়া হকের পরিপন্থী হবে না।

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ---এতে

বোঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলাম প্রকৃত পক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকাই হলো তাকওয়া। একেই বলা হয় ইসলাম।

আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মৃত্যু ইসলামের ওপরই হতে হবে---ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যু আসা উচিত নয়।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মৃত্যু কারও ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। যে কোন সময়, যে কোন অবস্থায় মৃত্যু আসতে পারে। কাজেই আয়াতের নির্দেশের অর্থ কি ? উত্তর এই যে, হাদীসে আছে كما تحيون تموتون وكما تموتون تحشرون অর্থাৎ তোমরা যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করবে, সে অবস্থায়ই মৃত্যু আসবে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু আসবে সেই অবস্থায়ই হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলামসম্মত পন্থায় জীবন অতিবাহিত করতে কৃতসংকল্প থাকে এবং সাধ্যমত

ইসলামের আদেশ-নিষেধ অনুসারে কাজ করে, ইনশাআল্লাহ্ তার মৃত্যু ইসলামের ওপরই হবে। তবে কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক সৎকর্মের মধ্যেই সারা জীবন অতিবাহিত করবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এমন কাজ করে বসবে যে, তার সমগ্র সৎকর্মকেই বরবাদ করে দেবে--এ কথা এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার কর্মে পূর্বেই আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা থাকে না। والله اعلم

মুসলমানদের জাতিগত শক্তির ভিত্তি ঃ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا

আয়াতে পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ও বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ এতে সর্বপ্রথম মানুষকে পরস্পর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, ঐক্য ও মৈত্রী যে প্রশংসনীয় ও কাম্য, তাতে জগতের জাতি-ধর্ম ও দেশ-কাল নির্বিশেষে সব মানুষই একমত। এতে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই। সম্ভবত জগতের কোথাও এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী ও উত্তম মনে করে। এ কারণে বিশ্বের সব দল ও গোত্রই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার আহবান জানায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, ঐক্য উপকারী ও অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতি বিভিন্ন দল-উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এরপর দলের ভেতরে উপদল এবং সংগঠনের ভেতরে উপসংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে, যাতে সঠিক অর্থে দুই ব্যক্তির ঐক্য কল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সাময়িক স্বার্থের অধীনে কয়েক ব্যক্তি কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে কিংবা স্বার্থোদ্ধারে অকৃতকার্য হলে শুধু তাদের ঐক্যই বিনষ্ট হয় না; বরং পরস্পর শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

চিন্তা করলে এর কারণ বোঝা যায় যে, প্রত্যেকেই জনগণকে স্ব স্ব পরিকল্পনা মাফিক একতাবদ্ধ করতে চায়। যদি অন্যদের কাছেও অনুরূপ পরিকল্পনা থাকে, তবে তারা তার সাথে একমত হওয়ার পরিবর্তে নিজের তৈরী করা পরিকল্পনার সাথে একতা-বদ্ধ হওয়ার আহবান জানায়। ফলে ঐক্যের প্রত্যেকটি আহবানের ফলস্বরূপ একই দলে ভাঙ্গন ও বিভেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং মতবিরোধের পঙ্কে নিমজ্জিত মানবতার অবস্থা দাঁড়ায় এরূপ ঃ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی (যতই ঔষধ প্রয়োগ করা হল, ব্যাধি ততই বেড়ে গেল)।

এ কারণে কোরআন পাক শুধু মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ হওয়ার উপদেশই দান করেনি; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার জন্য একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে। যা স্বীকার করে নিতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। মূলনীতিটি এই যে, কোন মানুষের মস্তিষ্কনিসৃত অথবা কিছুসংখ্যক লোকের রচিত ব্যবস্থা ও পরি-কল্পনাকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যে, তারা

এতে একতাবদ্ধ হয়ে যাবে---বিবেক ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। তবে বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক; একথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারে না। এখন মতভেদের একটিমাত্র ছিদ্রপথ খোলা থাকতে পারে যে, বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা কি এবং কোন্‌টি ? ইহুদীরা তওরাতের ব্যবস্থাকে এবং খৃস্টানরা ইনজীলের ব্যবস্থাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থা বলে দাবী করে। এমনকি, মুশরিকদের বিভিন্ন দলও স্ব স্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান বলেই দাবী করে থাকে।

কিন্তু মানুষ যদি গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে, তবে তার সামনে এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, শেষ নবী (সা) কর্তৃক আনীত আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ পয়গাম কোরআনের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলা যায় যে, আপাতত সম্বোধনের লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমান জাতি। তারা বিশ্বাস করে যে, আজ কোরআন পাকই এমন একটি জীবন-ব্যবস্থা, যা নিশ্চিতরূপেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ কারণে কিয়ামত পর্যন্ত এতে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধনের আশংকা নেই। তাই আপাতত আমি অমুসলিম দলসমূহের আলোচনা বাদ দিয়ে কোরআনে বিশ্বাসী মুসলমানদের বলছি যে, তাদের জন্য এটাই একমাত্র কর্মপদ্ধতি। মুসলমানের বিভিন্ন দল-উপদল কোরআন পাকের ব্যবস্থায় একমত হয়ে গেলে হাজারো দলগত, বর্ণগত ও অঞ্চলগত বিরোধ এক নিমেষে শেষ হয়ে যেতে পারে, যা মানবতার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। এরপর মুসলমানদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকলে তা হবে শুধু কোরআনের ব্যাখ্যা নিয়ে। এরূপ মতভেদ সীমার ভিতরে থাকলে তা নিন্দনীয় ও সমাজ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর নয়; বরং জ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। একে বশে রাখা ও সীমা অতিক্রম করতে না দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের মধ্যকার দল-উপদলগুলো যদি কোরআনী ব্যবস্থা থেকে সরে গিয়ে পরস্পর লড়াই করতে থাকে, তখন মতবিরোধ ও কলহ-বিবাদের কোন প্রতিকার থাকবে না। এ ধরনের মতানৈক্য ও বিভেদকেই কোরআন পাক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে এ কোরআনী মূলনীতিকে পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজ শতধাবিভক্ত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিভেদ মেটানোর অমোঘ ব্যবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সবাই মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এখানে আল্লাহ্‌র রজ্জু বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে হুযুর (সা) বলেন ঃ كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء

الى الارض অর্থাৎ কোরআন আল্লাহ্ তা'আলার রজ্জু যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত। ---(ইবনে কাসীর)

যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ حبل الله هو القران অর্থাৎ 'আল্লাহ্র রজ্জু হচ্ছে কোরআন।' ---(ইবনে কাসীর)

আরবী বাচন-পদ্ধতিতে 'হাবল'-এর অর্থ অঙ্গীকারও হয় এবং এমন যে কোন বস্তুকেই বলা হয়, যা উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। কোরআন অথবা দীনকে 'রজ্জু' বলার কারণ এই যে, এটা একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে দুনিয়াবাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে।

মোট কথা, কোরআনের এ বাক্যে বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতিই বিধৃত হয়েছে। কেননা প্রথমত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা কোরআনকে কাজেকর্মে বাস্তবায়িত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, সব মুসলমান সম্মিলিতভাবে একে বাস্তবায়িত করবে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হবে। উদাহরণত একদল লোক একটি রজ্জুকে ধরে থাকলে তারা সবাই এক দেহে পরিণত হয়ে যায়। কোরআন পাক অপর এক আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার রূপে ফুটিয়ে তুলেছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ۝

অর্থাৎ "যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা অতি অবশ্যই তাদের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী ও ভালবাসা পয়দা করে দেবেন।"

এছাড়া আয়াতে একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্তও বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা যখন আল্লাহ্র গ্রন্থকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তখন তাদের অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তিদের অনুরূপ, যারা কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করার সময় শক্ত রজ্জু ধারণ করে নিশ্চিত পতনের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ থাকে। সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সবাই মিলে কোরআনকে শক্তরূপে ধারণ করে থাকলে শয়তান তার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হবে না এবং ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় মুসলিম জাতির শক্তি সুদৃঢ় ও অজেয় হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোরআনকে আঁকড়ে থাকলেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শক্তি একত্রিত হয় এবং মরণোন্মুখ জাতি নবজীবন লাভ করে। পক্ষান্তরে কোরআন থেকে সরে থাকলে জাতীয় ও দলগত জীবনে যেমন বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনও সুখকর হয় না।

ঐক্য একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই সম্ভব ঃ ঐক্যের বিশেষ একটি কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে; কোথাও বংশগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণত আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কুরায়শকে এক জাতি ও বনূ-তামীমকে অন্য জাতি মনে করা হতো। কোথাও বর্ণগত পার্থক্যই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এক

জাতি এবং শ্বেতাঙ্গদের অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। কোথাও দেশগত ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্র মনে করা হয়েছে। ফলে হিন্দীরা এক জাতি ও আরবীরা অন্য জাতি হয়ে গেছে। আবার কোথাও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু নিয়ম-প্রথাকে ঐক্যের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। যারা এসব নিয়ম-প্রথা পালন করে না, তারা ভিন্ন জাতি। উদাহরণত ভারতের হিন্দু ও আর্য সমাজ।

কোরআন পাক এগুলোকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু 'হাবলুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রেরিত মজবুত জীবন-ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছে এবং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসীরা সবাই মিলে এক জাতি---যারা আল্লাহ্র রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাফিররা ভিন্ন জাতি—যারা এ শক্ত রজ্জুর সাথে জড়িত নয় خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ (তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন—অতঃপর তোমাদের একদল অবিশ্বাসী ও একদল বিশ্বাসী।) আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই। ভৌগোলিক সীমারেখার ঐক্য কিছুতেই জাতীয় ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, এ ঐক্য সাধারণত মানুষের ইচ্ছাধীন নয়; এটা নিজস্ব চেষ্টায় অর্জন করা যায় না। যে কৃষ্ণাঙ্গ, সে ইচ্ছা করে শ্বেতাঙ্গ হতে পারে না। যে কুরায়শ বংশীয়, সে তামীম বংশীয় হতে পারে না। যে হিন্দী, সে আরবী হতে পারে না। কাজেই ঐক্যের এ সব বন্ধন সীমিত অঞ্চলেই সম্ভবপর হতে পারে। এদের গণ্ডি কখনও সমগ্র মানব জাতিকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে বিশ্বজোড়া ঐক্য প্রতিষ্ঠার দাবী করতে পারে না। এ কারণেই কোরআন পাক "হাবলুল্লাহ্" অর্থাৎ কোরআন তথা আল্লাহ্ প্রেরিত জীবন ব্যবস্থাকে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু করেছে—যা অবলম্বন করা একটি ইচ্ছাধীন কাজ। প্রাচ্যের অধিবাসী হোক অথবা পাশ্চাত্যের, শ্বেতাঙ্গ হোক অথবা কৃষ্ণাঙ্গ, আরবী ভাষা বলুক অথবা হিন্দী-ইংরাজী, যে কোন গোত্রের এবং যে কোন বংশের মানুষ হোক এ যুক্তিযুক্ত ও নির্ভুল কেন্দ্রবিন্দু অবলম্বন করতে পারে। এবং বিশ্বের সব মানুষ এ কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে ভাই ভাই হতে পারে, যদি তারা পৈতৃক নিয়ম-প্রথার ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করে, তবে এ ছাড়া কোন যুক্তিযুক্ত ও নির্ভুল পথই পাবে না। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ করে আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তরূপে ধারণ করা ছাড়া তাদের গতি নেই। এর ফলশ্রুতিতে একদিন সমগ্র মানব জাতিই একটি শক্ত ও অনড় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে যাবে, অপরদিকে এ ঐক্যের ফলে প্রতিটি ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বীয় কর্ম ও চরিত্র সংশোধন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে।

এ বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি নিয়ে প্রতিটি মুসলমান বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, এটিই সঠিক ও নির্ভুল পথ; এদিকে এস। এ মূলনীতির জন্য মুসলমান যতই গর্ব করুক, অনুপযোগী হবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ইসলামী ঐক্যকে শতধাবিভক্ত করার জন্য ইউরোপীয়রা বহু শতাব্দী যাবত ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার

করেছে, তা স্বয়ং মুসলমান পরিচয় দানকারীদের মধ্যেও বিপুল সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে। বর্তমানে মুসলমানদের ঐক্য আরবী, মিসরী, হিন্দী, সিন্ধীতে বিভক্ত হয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত সর্বকালে, সর্বস্থানে তাদের সবাইকে উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানাচ্ছে ঃ এসব মূর্খতাসুলভ স্বাতন্ত্র্যবোধই প্রকৃতপক্ষে অনৈক্যের উদ্‌গাতা এবং এসবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঐক্য কোন যুক্তিসঙ্গত ঐক্যই নয়। তাই আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধারণ করার ভিত্তিতে ঐক্যের সঠিক পথ অবলম্বন কর। এ ঐক্য ইতিপূর্বেও তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের উপর জয়ী, প্রবল ও উচ্চাসনে আসীন করেছিল এবং পুনর্বার যদি তোমাদের ভাগ্যলিপিতে কল্যাণ থেকে থাকে, তবে তা এ পথেই অর্জিত হতে পারে।

মোট কথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও। দ্বিতীয়ত একে সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ কর, যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খল ঐক্যবন্ধন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার তা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্যের ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলার পর বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَفَرَّقُوا পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করো না। কোরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি এই যে, যেখানে ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলা হয়, সেখানেই ঋণাত্মক দিক উল্লেখ করে বিপরীত রাস্তায় অগ্রসর হওয়া থেকে বারণ করা হয়। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

এ আয়াতেও সরল পথে কায়েম থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং রিপুর তাড়নায় উদ্ভাবিত পথে চলতে নিষেধ করা হয়েছে। অনৈক্য যে কোন জাতির ধ্বংসের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কারণ। এ কারণেই কোরআন পাক বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে অনৈক্যের বীজ বপন করতে নিষেধ করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ

অর্থাৎ যারা ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।

এ ছাড়া কোরআন বিভিন্ন পয়গম্বরের উম্মতদের ঘটনাবলী বর্ণনা করে দেখিয়েছে যে, তারা কিভাবে পারস্পরিক মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঞ্ছনায় পতিত হয়েছে।

হযরত রসূলে করীম (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন। পছন্দনীয় জিনিসগুলো এই ঃ এক---তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। দুই---আল্লাহ্র কিতাব কোরআনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকবে। তিন---শাসনকর্তাদের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করবে।

অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এই ঃ এক---অনাবশ্যক কথাবার্তা ও বিতর্কানুষ্ঠান, দুই---বিনা প্রয়োজনে কারও কাছে ভিক্ষা চাওয়া এবং তিন---সম্পদ বিনষ্ট করা। ---(ইবনে কাসীর)

এখন প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেক মতভেদই কি নিন্দনীয় এবং মতভেদের কোন দিকই কি অনিন্দনীয় নেই? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়। বরং যে মতভেদে প্রবৃত্তির তাড়নার ভিত্তিতে কোরআন থেকে দূরে সরে চিন্তা করা হয়, তাই নিন্দনীয়। কিন্তু যদি কোরআনের নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও মেধার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, তবে সে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়, ইসলাম তা নিষেধও করে না। সাহাবায়ে-কিরাম, তাবেয়ীন এবং ফিকহ্বিদ আলিমগণের মধ্যকার মতভেদ ছিল এমনি ধরনের। এমন মতভেদকেই রহমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হ্যাঁ, যদি এসব শাখা বিষয়কেই দীনের মূল সাব্যস্ত করা হয় এবং এসব বিষয়ে মতভেদকে লড়াই-ঝগড়া ও বচসার কারণ বলে গণ্য করা হয়, তবে তাও নিন্দনীয়।

পারস্পরিক ঐক্যের উভয় দিক ব্যাখ্যা করার পর আয়াতে ঐ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে ইসলাম-পূর্বকালে আরবরা লিপ্ত ছিল। গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় অহরহ খুন-খারাবি ইত্যাদি কারণে গোটা আরব নিশ্চিহ্ন হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। একমাত্র ইসলামরূপে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতই তাদেরকে এহেন অশান্তির আগুন থেকে উদ্ধার করেছে। তাই বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ

অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তখন তিনিই তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়েছ। তোমরা জাহান্নামের গহবরের কিনারায় দণ্ডায়মান ছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।

অর্থাৎ শতাব্দীর শত্রুতা ও প্রতিহিংসার অনল থেকে বের করে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা)-এর বরকতে তোমাদের ভাই ভাই করে দিয়েছেন। এতে ইহকাল ও পরকাল সঠিক পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে এবং তোমাদের মধ্যে এমন অভাবিত বন্ধুত্ব কায়েম হয়ে যায়, যা দেখে শত্রুরা ভীত হয়ে পড়ে। এটা এমনই অনুগ্রহ, যা ভূ-পৃষ্ঠের সমগ্র ধন-ভাণ্ডার ব্যয় করেও লাভ করা যেত না।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, দুষ্ট লোকেরা আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বিগত যুদ্ধের স্মৃতি জাগরিত করে গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এর পরিপূর্ণ প্রতিকার হয়ে গেছে।

মুসলমানদের ঐক্য আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ঃ কোরআন পাকের এ উক্তি থেকে আরও একটি সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, অন্তরের মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা। সম্প্রীতি ও ঘৃণা সৃষ্টি করা তাঁরই কাজ। কোন দলের অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলারই অনুগ্রহের দান। আর একথা সবারই জানা যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ একমাত্র তাঁর আনুগত্যের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। অবাধ্যতা ও গোনাহ্ দ্বারা এ অনুগ্রহ অর্জিত হওয়া সুদূরপরাহত।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানরা যদি শক্তিশালী সংগঠন ও ঐক্য কামনা করে, তবে এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে অঙ্গের ভূষণ করে নেওয়া। এদিকে ইশারা করার জন্যই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ ---অর্থাৎ এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সত্যাসত্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন---যাতে তোমারা বিশুদ্ধ পথে থাক।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

(১০৪) আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে—আর, তারাই হলো সফলকাম। (১০৫) আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নির্দশনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে—তাদের জন্যও রয়েছে বিরাট আযাব।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মুসলমানদের সমষ্টিগত কল্যাণের দু'টি মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে স্বীয় অবস্থা সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ প্রত্যেকেই যেন আল্লাহ্-ভীতি ও তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র রজ্জু ইসলামকে শক্ত রূপে ধারণ করে। এভাবে ব্যক্তিগত সংশোধনের সাথে সাথে একটি সমষ্টিগত শক্তিও আপনা-আপনিই অর্জিত হয়ে যাবে। আলোচ্য দুই আয়াতে এ কল্যাণ-ব্যবস্থারই উপসংহারে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা শুধু নিজ কার্যধারাকে সংশোধন করেই ক্ষান্ত হবে না ; বরং অন্য ভাইদের সংশোধনের চিন্তাও সাথে সাথে করবে। এভাবেই গোটা জাতির সংশোধন হবে এবং ঐক্যও স্থিতিশীল হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হওয়া জরুরী , যারা (অন্য লোক-দেরও) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজে আদেশ করবে এবং মন্দকাজে নিষেধ করবে । তারাই (পরকালে সওয়াব লাভে) পূর্ণ সফলকাম হবে ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা প্রকাশ্য নির্দেশাবলী পৌঁছার পরও (ধর্মে) বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং (রিপুর তাড়নায়) পরস্পর মতবিরোধ করেছে। (কিয়ামতের দিন) তাদের কঠোর শাস্তি হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ঃ প্রথমে আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন এবং দ্বিতীয়ত প্রচার বা তবলীগের মাধ্যমে অপরের সংশোধন। আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশটি বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টি আয়াতের সারমর্ম এই যে, নিজেও স্বীয় কাজকর্ম ও চরিত্র আল্লাহ্ প্রেরিত আইন অনুযায়ী সংশোধন কর এবং অন্যান্য ভাইয়ের কাজকর্ম সংশোধন করারও চিন্তা কর। এ বিষয়বস্তুটিই সূরা 'ওয়াল-আসর'-এ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

অর্থাৎ পরকালের ক্ষতি থেকে তারা মুক্ত, যারা নিজেরাও ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরকেও বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের নির্দেশ দেয়।

জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের জন্য একটি শক্তিশালী ঐক্য-সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। পূর্ববর্তী আয়াতে "আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর" বলে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনিভাবে এ ঐক্য সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখার জন্য দ্বিতীয় কাজটিও অপরিহার্য।